



এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার: ঢাকা



HEGD

www.e-ilm.weebly.com

মোঃ আবদুল হামিদ ও মোঃ আবদুল হালিম কর্তৃক
এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা
হইতে প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জুন, ১৯৯৪ ইং

হাদিয়া : ৪৮.০০ টাকা মাত্র

এমদাদিয়া প্রেস, ৫/১ নং গিরদে উর্দু রোড, ঢাকা হইতে
এম, এ, হামিদ কর্তৃক মুদ্রিত
www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ভূমিকা

পাশ্চাত্যের কায়েনাত, ফখরে মওজুদাত, রাহে দো-আলম, রাসুলে আকরাম (দঃ)-এর সীরাত বা পবিত্র জীবন-চরিত পঠন ও পাঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার মাধ্যমে রাখেন। এই জনাই যখন হইতে মুসলমানদের মধ্যে বইপুস্তক লিখার প্রচলন হইয়াছে, তখন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি প্রত্যেক যুগের আলেমগণ আপন আপন (দঃ)-এর প্রাসারে নিজ নিজ মাতৃভাষায় নবী করীম (দঃ)-এর অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই অবিচ্ছিন্ন ধারা-পরম্পরায় কত যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং আরো কত যে রচিত হইবে তাহার সংখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন।

نه من بران گل عارض غزل سرایم وبس

که عندلیب تواز هرطرف هزاران اند

“যেখানে হাজার বুলবুলি ফিরে
গাহিয়া তাঁহার প্রশংসা গান,
সেখানে আমি হই কেন্ ছার,
নগণ্য অতি যাহার স্থান?”

মুসলমান লিখকগণ ছাড়াও হাজার হাজার অমুসলিম লিখক নবী করীম (দঃ)-এর জীবনীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই ব্যাপারে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ভূমিকা অশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে বিশ-ত্রিশখানা গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদেরও জানা আছে। কিন্তু তাঁহার সাধারণভাবে ঘটনা বর্ণনার ব্যাপারে পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের রচনা পাঠে মুসলমানদের বিরত থাকাই উচিত। মাতৃভাষা নির্দিধায় বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র হযরত খাতিমুল-আসিয়া (দঃ)-এর পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত অপর কাহারও জীবনী সম্পর্কে এত গুরুত্ব দান করা হয় নাই।

জনৈক ইউরোপীয় সীরাত-রচয়িতা বলিতেছেনঃ “মুহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনীকারদের ধারা অতি ব্যাপক ও বিস্তৃত, যাহার সমাপ্তি অসম্ভব। তবে ইহার মধ্যে স্থান লাভ করা মহা গৌরবের বিষয়।” —(সীরাতুলনবী হইতে)

উর্দু ভাষায়ও পুরাতন ও নূতন অনেক সীরাতগ্রন্থ রহিয়াছে। কিন্তু আমার দৃষ্টি দীর্ঘ দিন ধরিয়া এমন একটি সংক্ষিপ্ত সীরাত গ্রন্থের অন্বেষণ করিতেছিল যাহা যে কোন পেশাজীবী মুসলমান নর-নারী দুই এক বৈঠকে সমাপ্ত করিয়া নিজের ঈমানকে সতেজ করিতে পারে এবং নবী-জীবনের আদর্শকে আপন দিশারী বানাতে পারে। যাহা ইসলামী সংগঠন এবং মাদ্রাসাসমূহের প্রাথমিক পাঠ্য-সূচীতে স্থান পাইতে পারে এবং যাহার মধ্যে সতর্কতা সহকারে নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত চিত্র উহার আসল ছাঁচে বিধৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু উর্দু ভাষায় এমন কোন পুস্তিকা আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ইতিমধ্যেই শিমলার কোন কোন বন্ধু তাঁহাদের ইসলামী-সংগঠনের জন্য এমনি একখানা পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া অধীনের নিকট আন্ডার জানাইলে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির স্বল্পতা এবং অধ্যাপনা ও অধ্যয়নের ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই আশায় লেখনী ধারণ করিলাম যে, যখন হযরত সাইয়্যিদুল কাওনাইন (দঃ)-এর জীবনী লেখকদের নাম আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হইবে, তখন হয়তোবা এই অধমের নামটিও উহার কোন এক কোণে উল্লেখ থাকিবে।

ليل همين كه قافية كل شود بس ست

“বুলবুলির আর কোন কাজ নাই
সে শুধু গাহিবে ফুলের গান।”

সুতরাং পরম করুণাময় আল্লাহর নামে এই পুস্তিকাখানা রচনার কাজ আরম্ভ করিয়াছি এবং নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রাখিয়া সীরাত গ্রন্থসমূহের সংক্ষিপ্তসার ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি।

১। পুস্তিকাখানা যাহাতে দীর্ঘায়িত না হইয়া পড়ে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। এই জনা আরবের ভৌগোলিক বিবরণ, প্রাক-ইসলাম যুগের আরব ও অনারবের সার্বিক অবস্থা—যাহাকে সীরাতেের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করা হয় এবং যাহা এক দিক দিয়া অত্যন্ত উপকারীও বটে—সেগুলি পরিহার করিয়া শুধু ঐ অবস্থাসমূহকে যথেষ্ট বিবেচনা করা হইয়াছে, যাহা একান্তই নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনীর সহিত সম্পৃক্ত। এই সংক্ষেপায়ণের কারণে ইহার আরেক নাম *وجز السير لخير البشر* “সৃষ্টির সেরা মহামানবের সংক্ষিপ্ত জীবনী” রাখা হইয়াছে।

। সংক্ষেপায়ণের সাথে সাথে যাহাতে সার্বিক পরিপূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকে
 ১৩৩ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে এবং আল্লাহর করুণায় প্রায় সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ই
 পুস্তিকায় আসিয়া গিয়াছে।

১৪। জিহাদ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের যে সব ভ্রান্ত ধারণা
 উহার বিশদ ও সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করা হইয়াছে।

১৫। পুস্তিকাটির ভিত্তিমূল হইতেছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহ—
 আল্লাহর উদ্ধৃতি যথাস্থানে পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ উল্লেখ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকখানা
 পুস্তক নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) মেশকাত (২) শরাহসহ সিহাহ সিন্তা (৩) কানযুল উম্মাল (৪) আল্লামা
 ইবনে কাসাইসে কুবরা (৫) মাওয়াহিব লাদুনিয়া (৬) হাফিয়ে হাদীস আল্লামা
 আব্দুল্লাহ মোগলতাই রচিত “সীরাতে মোগলতাই” (৭) সীরাতে ইবনে হিশাম
 (৮) খাফাজী এর শরাহ সহ কাযী আযায় রচিত “শিফা” (৯) সীরাতে হালবিয়া
 (১০) আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রচিত “যাদুল মা’আদ” (১১) তারীখে ইবনে
 কাসাইসের (১২) শাহ অলিউল্লাহ রচিত “সুররুল্-মাহ্যুন” (১৩) শেখ আহমদ
 হাম্বলি রচিত “আওজায়ুস্-সীয়ার” (১৪) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা
 আব্দুল্লাহ আলী খানভী (রহঃ) রচিত “নাশরুত্-তীব” ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের সহস্র সহস্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যে, তিনি এই অধর্মের
 বিধানে প্রয়াসকে কবুল করিয়াছেন এবং সবার আগে হাকীমুল উম্মত হযরত
 মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহঃ) ইহাকে পছন্দ করিয়া খানকাহে এমদাদিয়ার
 পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন আর তদীয় রচনা “তাতিম্মাতে অসিয়ত” পুস্তিকায়
 প্রধান ঘোষণা প্রদান করতঃ অন্যান্য সকলকে তৎপ্রতি উৎসাহিত করিয়াছেন।
 পুস্তিকা মাত্র তিন মাসের মধ্যে ইহাকে পাঞ্জাব, হিন্দুস্তান এবং বাংলার শতাধিক
 মাদ্রাসা এবং ইসলামী সংগঠনের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শ্রী সম্প্রতি সাহারানপুরস্থ মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম সাহেব
 জানাইয়াছেন যে, তাঁহার মজলিসে শুরাও পুস্তিকাখানাকে এবতেদায়ী জামাআতের
 পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْلَىٰ وَأَمَّا

আশীর্বাদ-বাণী

পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহঃ) তাঁহার অসংখ্য রচনা ও ইসলামী খিদ্মতের জন্য বাংলাদেশের ছোট বড় সকলের নিকট পরিচিত। তাঁহার রচিত “সীরাতে খাতিমুল আশ্বিয়া” গ্রন্থখানা আকারে ছোট হইলেও এত তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ যে, হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী চিশ্তী (রহঃ) ইহাকে বিভিন্ন আঞ্জুমান এবং মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করার সুফারিশ করিয়াছিলেন। বর্তমানে উপমহাদেশের অগণিত মাদ্রাসায় ইহা সীরাতে বিষয় হিসাবে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত রহিয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থখানা উর্দু হইতে বাংলায় অনুবাদ করিয়া তরুণ লিখক মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকার সুযোগ্য মুহাদ্দিস্ স্নেহাঙ্গদ মাওলানা আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী সাহেব বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের জন্য এক বিরাট খিদ্মত আনুজাম দিয়াছেন। আল্লাহ্ পাক ইহার বরকতে অনুবাদককে আরো অধিক ইল্ম ও দ্বীনের খিদ্মত করার তাওফীক দান করুন এবং ইহাকে আমাদের সকলের জন্য মাগ্ফেরাতেও অর্ছীলা করুন—আমীন!

বিনীত

উবায়দুল হক

সাবেক হেড-মাওলানা

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

খতীব

জাতীয় মস্জিদ বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা

২৫ জুন, ১৯৮৮ ইং

অনুবাদের কথা

দুনিয়ার বুকে এই পর্যন্ত যত নবী, রাসূল, দার্শনিক ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁহাদের মধ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই একমাত্র ব্যক্তি যাহার জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা ইতিহাসের অধ্যায় হইয়া গিয়াছে। জীবনের এমন কোন অংশ নাই যেখানে আমরা তাঁহার গৌরবদণ্ডের চারণা লক্ষ্য করি না। এমন কোন দিক নাই যে সম্পর্কে তিনি নির্ভুল নির্দেশনা দান করিয়া যান নাই। এই কারণেই পৃথিবীতে একমাত্র মহানবী হযরত মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতই সর্বাধিক আলোচিত হইয়াছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর বিশাল ও কর্মবহুল জীবনের এক একটি দিক এত ব্যাপক যে, উহার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার হক আজ পর্যন্ত কেউ আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্যই তাঁহার জনৈক প্রশংসাকারী লিখিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন :

لَا يُمَكِّنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر

সুদূরদেশের এই অক্ষমতা নবী মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্বও শ্রেষ্ঠত্বই পরিচায়ক। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের লিখনী স্তব্ধ হইয়া যায় নাই। নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানার এবং বিশ্লেষণ করার গভীর আগ্রহ মানব প্রদমা বাসনা লইয়া তাঁহারা ছোট বড় নানা আকারের অসংখ্য সীরাত-গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিতেছেন। ইনশাআল্লাহু এই ধারা-পরম্পরা কেয়ামত পর্যন্ত চালাইয়া থাকিবে।

এই পর্যায়ে পাক-ভারত-বাংলা উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ইসলামী লেখক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' (রহঃ)-এর উর্দু ভাষায় লিখিত গানারো "খাতিমুল-আম্বিয়া" নামক গ্রন্থখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানা আকারে প্রায় ত্রিশ ও ত্রাত্ত তথ্যবহুল। তিনি সমুদ্রকে পেয়ালার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। পৃথিবীতে গ্রন্থখানা সর্বস্তরে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। আল্লাহু তা'আলা আমাদের এই নিঃস্বার্থ দ্বীনি খিদমতের জন্য পুরস্কৃত করুন—আমীন!

গ্রন্থখানার গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব ইহাকে বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের খিদ্মতে পেশ করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। তাই, আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও যোগ্যতার শত অভাব সত্ত্বেও ইহার অনুবাদ কাজে হাত দিয়াছি এবং আল্লাহ্ পাকের অশেষ রহমতে “সীরাতে খাতিমুল-আম্বিয়া” গ্রন্থখানা ভাষান্তরিত করিয়া সূধী পাঠকের সম্মুখে পেশ করিতে প্রয়াস পাইলাম। অনুবাদের ভাষা যথাসম্ভব সহজ ও সরল করার চেষ্টা করিয়াছি। পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনগণ ইহা হইতে যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন তবে আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গ্রন্থখানা অনুবাদের ব্যাপারে আমাকে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররামের স্বনামধন্য খতীব হযরত মাওলানা উবায়দুল হক সাহেব তাঁহার মূল্যবান উপদেশ দ্বারা যে অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে চির কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল দান করুন। এমদাদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ গ্রন্থখানা প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি। পরিশেষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা রহিল— তিনি যেন অধমের এই নগন্য খিদ্মতটুকু কবুল করেন এবং ইহাকে পরকালে নবী করীম (দঃ)-এর শাফায়াত লাভের অছিল্লা করিয়া দেন—আমীন!

বিনীত

আবুল কালাম মোঃ আব্দুল লতিফ চৌধুরী

মুহাদ্দিস,

মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

২৫ জুন, ১৯৮৮ ইং

■ সূচী-পত্র ■

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| নবী করীম (দঃ)-এর বংশ-পরিচিতি | ১ |
| ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহ | ২ |
| নবী করীম (দঃ)-এর শুভ-জন্ম | ৩ |
| নবী করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতার ইস্তিকাল, দুগ্ধপান এবং শৈশবকাল | ৫ |
| নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম বাক্য | ৭ |
| নবী করীম (দঃ)-এর শ্রেয়সা জননীর ইস্তিকাল, খাদ্দুল মুত্তালিবের পরলোক গমন | ৯ |
| নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম সিরিয়া ভ্রমণ, গ্রাহার সম্পর্কে জনৈক বিরাট ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী, ফায়দা, আবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ | ১০ |
| সেরত খাদীজার সহিত বিবাহ | ১১ |
| সেরত খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তান, নবী করীম (দঃ)-এর কন্যাগণ | ১৩ |
| মর্জিলাগণের জন্য স্মরণীয় | ১৪ |
| অন্যান্য পুণ্যবতী পত্নীগণ | ১৫ |
| নবী করীম (দঃ)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ | ১৮ |
| নবী করীম (দঃ)-এর চাচা ও ফুফুগণ, নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারগণ | ২৪ |
| আবগহ নির্মাণ ও সর্বসম্মতিক্রমে মহানবীকে 'আল-আমীন' স্বীকৃতি দেওয়া | ২৫ |
| নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি, খাদ্দীবাতে ইসলাম প্রচার—তবলীগের প্রথম পর্যায় | ২৬ |
| সেলামের প্রকাশ্য দাওয়াত | ২৮ |
| সমগ্র আরবের শত্রুতার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর দৃঢ়তা, সমগ্র আরব জাতির বিরুদ্ধে মহানবী (দঃ)-এর উত্তর | ২৯ |
| সন্যাসের মাঝে ঘৃণা ছড়ানো ও ইহার বিপরীত ফল, সাহাবীদের নির্যাতন ও তাঁহার দৃঢ়তা | ৩০ |
| নবী করীম (দঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা এবং তাঁহার প্রকৃষ্ট মো'জেযা | ৩১ |

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| মহানবীর প্রতি কুরাইশদের প্রলোভন ও তাঁহার উত্তর | ৩২ |
| সাহাবাদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশ | ৩৩ |
| তোফায়েল ইবনে আমর দুসী (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ | ৩৬ |
| আবু তালেবের ওফাত | ৩৭ |
| হিজরতে তায়েফ, নবী করীম (দঃ)-এর ইসরা ও মো'রাজ | ৩৮ |
| নবীর ইসরা সম্পর্কে চাক্কুস সাক্ক্য | ৪০ |
| স্বয়ং কুরাইশ-কাফিরদের প্রত্যক্ষ-সাক্ক্য | ৪১ |
| পবিত্র মদীনায় ইসলাম | ৪২ |
| মদীনায় ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা | ৪৪ |
| মদীনায় হিজরতের সূচনা | ৪৬ |
| নবী করীম (দঃ)-এর মদীনায় হিজরত | ৪৭ |
| সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান | ৪৮ |
| সওর গিরিগুহা হইতে মদীনা যাত্রা, | |
| সুরাকা ইবনে মালেকের অশ্ব মুক্তিকা-গর্ভে ধ্বসিয়া যাওয়া | ৪৯ |
| সুরাকার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের স্বীকারোক্তি | ৫০ |
| নবী করীম (দঃ)-এর মো'জ্জিয়া, স্বামীসহ উম্মে মা'বাদের ইসলাম গ্রহণ, | |
| কুবায় অবতরণ | ৫১ |
| হযরত আলীর হিজরত এবং কুবায় মিলন, ইসলামী তারিখের সূচনা, | |
| নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র মদীনায় প্রবেশ | ৫২ |
| মসজিদে নববী নির্মাণ | ৫৩ |

প্রথম হিজরী

| | |
|--|----|
| সারিয়াহ্-এ-হামযা (রাঃ) ও সারিয়াহ্-এ-উবায়দা (রাঃ) | ৫৪ |
| ইসলাম স্বীয় প্রচারে তরবারীর মুখাপেক্ষী নহে | ৫৭ |
| রাজনীতিবিবর্জিত ধর্ম ও অস্ত্রবিবর্জিত রাজনীতি পূর্ণাঙ্গ নহে | ৫৮ |
| গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্ | ৬২ |
| গুরুত্বপূর্ণ গায়ওয়াহ্ ও সারিয়াহ্ এবং বিবিধ ঘটনা— | |
| প্রথম সারিয়াহ্ হযরত হামযার নেতৃত্বে | ৬৫ |
| সারিয়াহ্-এ-উবায়দা ইবনুল হারেস এবং ইসলামে তীরান্দাজীর সূচনা | ৬৬ |

দ্বিতীয় হিজরী

| | |
|----------------|----|
| কেবলা পরিবর্তন | ৬৬ |
|----------------|----|

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|--------|
| সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ্ এবং ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমত | ৬৬ |
| দশম যুদ্ধ | ৬৭ |
| মুসলমানদের আত্মোৎসর্গ | ৬৮ |
| শতাব্দী সাহায্য, মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ | ৬৯ |
| মুসলমানদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ, আবু-জাহলের পতন | ৭১ |
| আল্লাহর শাসন মো'জেযা, হুশিয়ামী | ৭২ |
| মুসলমানদের সহিত মুসলমানদের আচরণ, | |
| মুসলমান দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা, ইসলামী সমতা | ৭৩ |
| মুসলমান আসের ইসলাম গ্রহণ | ৭৪ |
| মুসলমানী রাজনীতি এবং শিক্ষার উন্নতি, এই বৎসরের বিবিধ ঘটনা | ৭৫ |
| তৃতীয় হিজরী | |
| সারিয়াহ্-এ-গাতফান এবং | |
| মুসলমান করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র-সংক্রান্ত মো'জেযা | ৭৬ |
| মুসলমান হাফসা ও যয়নাবের সহিত বিবাহ, উহুদ-যুদ্ধ | ৭৭ |
| মুসলমান বাহিনী বিন্যাস এবং অল্পবয়স্ক সাহাবা-তনয়দের জেহাদের স্পৃহা | ৭৮ |
| মুসলমান করীম (দঃ)-এর নূরানী চেহারা আহত হওয়া, | |
| মুসলমানদের আত্মোৎসর্গ | ৮০ |
| চতুর্থ হিজরী | |
| মুসলমান মাউনা অভিমুখে সারিয়াহ্-এ-মুনযির (রাঃ) | ৮১ |
| পঞ্চম হিজরী | |
| মুসলমান-ইছদী একা | ৮২ |
| সারিয়াহ্-এ-আহযাব তথা পরিখায়ুদ্ধ | ৮৩ |
| মুসলমানদের উপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ এবং আল্লাহর সাহায্য, বিবিধ ঘটনা | ৮৪ |
| ষষ্ঠ হিজরী | |
| মুসলমানবিয়ার সন্ধি, নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা | ৮৫ |
| মুসলমান শাসকবর্গের প্রতি ইসলামের দাওয়াত | ৮৬ |
| মুসলমান খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ও | |
| মুসলমান আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ, | ৮৮ |
| সপ্তম হিজরী | |
| মুসলমানদের যুদ্ধ | ৮৮ |

| | |
|--------------------------|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ফাদাক বিজয়, উমরা-এ-কাযা | ৮৯ |

অষ্টম হিজরী

| | |
|---|----|
| মু'তার যুদ্ধ | ৮৯ |
| মক্কা বিজয় | ৯০ |
| মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সহিত মুসলমানদের আচরণ, নবী করীম (দঃ)-এর মহত্ব এবং আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ | ৯১ |
| হোনায়েনের যুদ্ধ | ৯২ |
| এক মহান মো'জেযা, তায়েফ যুদ্ধ, উমরা-এ-জি'রানা | ৯৪ |

নবম হিজরী

| | |
|---|----|
| তবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলন, কতিপয় মো'জেযা | ৯৫ |
| মসজিদে যেরারে অগ্নি-সংযোগ, | |
| প্রতিনিধিদলের আগমণ এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ | ৯৬ |
| সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল, বনী-ফাযারার প্রতিনিধি দল, বনী-তামীমের প্রতিনিধি দল, বনী-সা'দ ইবনে বকরের প্রতিনিধি দল, কিন্দার প্রতিনিধি দল, বনী-আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল, বনী-হানীফার প্রতিনিধি দল | ৯৭ |
| বনী-কাহতানের প্রতিনিধি দল, বনী-হারিসের প্রতিনিধি দল, সিন্দীকে আকবর (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়ন | ৯৯ |

দশম হিজরী

| | |
|--------------------------------------|-----|
| হজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায় হজ্জ | ৯৯ |
| আরাফাতের খুতবা বা বিদায়-হজ্জের ভাষণ | ১০০ |

একাদশ হিজরী

| | |
|--|-----|
| সারিয়াহ্-এ-উসামা, নবী করীম (দঃ)-এর অন্তিম পীড়া | ১০১ |
| হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ইমামত, শেষ নবীর শেষ ভাষণ | ১০২ |
| নবী করীম (দঃ)-এর সর্বশেষ বাক্যসমূহ | ১০৪ |
| নবী করীম (দঃ)-এর মহান চরিত্র ও মো'জেযা | ১০৬ |
| নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযাসমূহ | ১০৮ |
| "জাওয়ামিউল-কালিম" চেহেল-হাদীস | ১১০ |
| স্জাতব্য | ১১১ |

সীরাতে খাতিমুল-আম্বিয়া



নবী করীম (দঃ)-এর বংশ-পরিচিতি

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র বংশ সমগ্র পৃথিবীর বংশাবলী হইতে অধিক সম্ভ্রান্ত^১ এবং উত্তম। ইহা এমন একটি বাস্তব সত্য যে, মক্কার কাফেরগণ এবং তাঁহার পরম শত্রুগণ তাহা অস্বীকার করিতে পারে নাই। হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) কাফের খানাকালীন রোম-সম্রাটের সম্মুখে তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। অথচ তিনি তখন প্রার্থনা করিতেন যে, যদি সুযোগ হয়, তবে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি কলঙ্ক আরোপ করিবেন।

পিতার দিক হইতে নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র বংশ পরম্পরা এইরূপ : মুহাম্মদ (সঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ (সঃ) কুসাই ইবনে কেলাব ইবনে মুররা ইবনে কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালের (সঃ) ফেহের ইবনে মালিক ইবনে নাযার ইবনে কেনানাহু ইবনে খোয়াইমাহ ইবনে মদকেকাহ ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নিযার ইবনে মা'দ ইবনে আদনান।

এই পর্যন্ত বংশ-তালিকা সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত। এখান হইতে হযরত আদম (সঃ) পর্যন্ত তালিকায় মতবিরোধ থাকায় উহার বর্ণনা বর্জন করা হইল।

মাতার দিক হইতে বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ : মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আমেনা বিনতে আবু হান্সা ইবনে আবদে মানাফ ইবনে যুহুরা ইবনে কেলাব। সুতরাং দেখা যাইতেছে কেলাব ইবনে মুররাহ পর্যন্ত গিয়া নবী করীম (দঃ)-এর পিতৃ ও মাতৃ বংশ পরস্পর একত্রে মিলিয়া যায়।

১১৩।

আমায়েরে আবু নাসিমে মারফু রেওয়ায়ত দ্বারা বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আমেনা, "আমি পৃথিবীর উদয়াচল হইতে অন্ত্যচল পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি: কিন্তু বনু হাশিম তাহা উত্তম কোন খান্দান দেখি নাই।" —মাওয়াহিব

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রকাশিত নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহঃ

সুবহে সাদেকের বিশ্বব্যাপী আলো আর দিগন্তের রক্তিম আভা যেমনিভাবে পৃথিবীকে সূর্যোদয়ের সুসংবাদ দান করে, তেমনিভাবে নবুওয়ত-রবি (দঃ)-এর উদয়কাল যখন ঘনাইয়া আসিল, তখন পৃথিবীর দিকে দিকে এমন ঘটনারাজি প্রকাশ পাইতে লাগিল, যাহা সুস্পষ্টরূপে নবী করীম (দঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ বহন করিতেছিল। মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় এইগুলিকে 'ইরহাসাত' বা অপেক্ষমান নিদর্শন বলা হইয়া থাকে।

নবী করীম (দঃ)-এর শ্রদ্ধেয়া জননী বিবি আমেনা হইতে বর্ণিত আছে, যখন ছয়র (দঃ) তাঁহার গর্ভে স্থিতি লাভ করিলেন, তখন স্বপ্নে তাঁহাকে সুসংবাদ প্রদান করা হইল যে, "তোমার গর্ভে যে সন্তানটি রহিয়াছে তিনি এই উম্মতের সরদার। যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হইবেন তখন তুমি এইরূপ প্রার্থনা করিওঃ আমি তাঁহাকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করিলাম। আর তাঁহার নাম মুহাম্মদ (দঃ) রাখিও।"

—সীরাতে ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেন, "মুহাম্মদ (দঃ) আমার গর্ভে আগমন করার পর আমি একটি উজ্জ্বল জ্যোতি দেখিতে পাইলাম, যাহার ফলে বসরা নগরী ও সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আমার দৃষ্টি-সীমানায় চলিয়া আসিল।" —সীরাতে ইবনে হিশাম

তিনি আরো বলেন, "আমি কোন নারীকে মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা হাল্কা ও ক্রেশ-হীন গর্ভ ধারণ করিতে দেখি নাই। অর্থাৎ, সাধারণতঃ নারীদের গর্ভাবস্থায় যে বমি বমি ভাব বা অবসাদ অবস্থা ইত্যাদি হইয়া থাকে অনুরূপ কিছুই আমার অনুভূত হয় নাই।" এতদ্ব্যতীত আরো বহু ঘটনা রহিয়াছে, যাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ণনা করার অবকাশ নাই।

নবী করীম (দঃ)-এর শুভ-জন্ম

প্রদিকাকংশ আলেম এই বিষয়ে একমত যে, 'আস্হাবে ফীল' যে বৎসর কাবা শরীফ আক্রমণ করিয়াছিল, নবী করীম (দঃ) সেই বৎসরের রবিউল-আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং আল্লাহ পাক তাহাদিগকে আবাবীল নামক কতিপয় ক্ষুদ্র ও নগণ্য পাখির মাধ্যমে পরাভূত করিয়া দেন। পবিত্র কোরআনের "সুরা-ফীলে" ইহার সর্বাঙ্গপূর্ণ বর্ণনা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আস্হাবে ফীলের ঘটনাটিও ছিল নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত বরকতসমূহের ভূমিকা স্বরূপ। নবী করীম (দঃ) সেই গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা পরবর্তীকালে হাজ্জাজ-ভ্রাতা মুহাম্মদ ইবনে 'উসুফের' অধিকারে আসিয়াছিল।

কোন কোন ঐতিহাসিকের^১ মতে 'আস্হাবে ফীলের'* ঘটনাটি ৫৭১ খৃষ্টাব্দের ১০শে এপ্রিল সংঘটিত হইয়াছিল। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্মের ৫৭১ বৎসর পরে হইয়াছিল।

হাদীস শাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে আসাকির^৩ পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসে লিখিয়াছেনঃ হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যে ১ হাজার ২ শত বৎসরের ব্যবধান ছিল। আর হযরত নূহ (আঃ) হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ১ শত ৪২ বৎসর, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত ৫ শত ৬৫ বৎসর, হযরত মূসা (আঃ) হইতে হযরত দাউদ (আঃ) পর্যন্ত ৫ শত ৬৯ বৎসর, হযরত দাউদ (আঃ) হইতে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত ১ হাজার ৩ শত ৫৬ বৎসর এবং হযরত ঈসা (আঃ) হইতে হযরত খাতিমুল-আস্মিয়া (দঃ)-এর মাঝখানে ৬ শত বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে।

টিকা

১০ সীরাতে মোগলতাব্বি, পৃষ্ঠা ৫

২০ দুরুসুত তারীখুল ইসলামী লিল হাইয়াত, পৃষ্ঠা ১৪

৩০ এই সম্পর্কে আরো বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। কিন্তু ইবনে আসাকির এই বর্ণনাকেই সঠিক বলিয়াছেন। — ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২১

* ইয়ামনের বাদশাহ আবরাহা তাহার বিশাল হস্তী-বাহিনী লইয়া কাবা শরীফ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল। ইহাদিগকে 'আস্হাবে ফীল' বলা হয়।

এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ) হইতে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান হইতেছে ৫ হাজার ৩২ বৎসর। আর বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক হযরত আদম (আঃ)-এর বয়স ছিল ৯ শত ৬০ বৎসর। এই হিসাবে হযরত আদম (আঃ)-এর পৃথিবীতে অবতরণের প্রায় ৬ হাজার বৎসর পরে অর্থাৎ, সপ্তম সহস্রাব্দে হযরত খাতিমুল আশিয়া (দঃ) এই পৃথিবীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।

(তারীখে ইবনে আসাকির, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক হইতে— প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯ ও ২০)

সারকথা, যেই বৎসর ‘আস্হাবে ফীল’ কা’বা ঘর আক্রমণ করে, সে বৎসরেরই রবিউল-আউয়াল মাসের ১২ তারিখ^১ রোজ সোমবার—দিনটি ছিল পৃথিবীর জীবনে এক অনন্য সাধারণ দিবস, যে দিন নিখিল ভূবন সৃষ্টির মূল লক্ষ্য, দিবস-রজনীর পরিবর্তনের মুখ্য উদ্দেশ্য, আদম (আঃ) ও বনী-আদমের গৌরব, নূহ (আঃ)-এর কিসতীর নিরাপত্তার নিগূঢ় তাৎপর্য, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রার্থনা এবং হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের উদ্দীষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বৃকে শুভাগমন করেন।

একদিকে পৃথিবীর দেবালয়ে নবুওয়ত-রবির আবির্ভাব ঘটে আর অপরদিকে ভূমিকম্পের আঘাতে পারস্য রাজপ্রাসাদের^২ ১৪টি চূড়া ধ্বসিয়া পড়ে, পারস্যের শ্বেত উপসাগর সহসাই শুকাইয়া যায়, পারস্যের অগ্নিশালার সেই অগ্নিকুণ্ড নিজে নিজেই নিভিয়া যায় যাহা বিগত এক হাজার বৎসর যাবৎ মুহূর্তের জন্যও নির্বাপিত হয় নাই। —সীরাতে মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ৫

টিকা

১০ সর্ব-সম্মত মতানুসারে নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম রবিউল-আউয়াল মাসের সোমবারে হইয়াছিল। কিন্তু তারিখ নির্ধারণের ব্যাপারে ৪টি রেওয়ায়ত প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। যথাঃ দ্বিতীয়, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ তারিখ। হাফিজ মোগলতাস্ত (রহঃ) “২রা তারিখ” এর রেওয়ায়তকে গ্রহণ করিয়া অন্যান্য রেওয়ায়তকে দুর্বল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত হইতেছে “দ্বাদশ তারিখের” রেওয়ায়ত। এমনকি হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) ইহার উপর ইজমার দাবী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকেই কামেলে ইবনে আসীরে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাহমুদ পাশা মিশরী যাহা গণনার মাধ্যমে “৯ তারিখ”কে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা জমহরের বিরোধী সনদবিহীন উক্তি। চন্দ্রোদয়ের স্থান বিভিন্ন হওয়ার কারণে গণনার উপর এমন কোন নির্ভরযোগ্যতার জন্ম হয় না যে, ইহার উপর ভিত্তি করিয়া জমহরের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।

২০ মাওয়াহিব।

যখন তখনই একটি জিন্দা খাওয়া উপাসনা ও যাবতীয় গোমরাহাঁর পরিসমাপ্তির সাহায্য এবং পাবসা ও রোম সাহায্যের পতনের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

নিশ্চয়ই আদাসমুহুরে বর্ণিত আছে যে*, নবী করীম (দঃ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মাথার মেহময়ী জননী উদর হইতে এমন একটি নূর প্রকাশিত হয় যাহার আলোকে উদয়াল ও অস্ত্রাল আলোকিত হইয়া পড়ে।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (দঃ) যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তিনি উভয় হাতের উপর ভর দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। তারপর তিনি এক মুষ্টি মাটি গুলিয়ে ফেলিয়া লইলেন এবং আকাশের দিকে তাকাইলেন। —মাওয়াহিবে লা দুমিয়া নবী করীম (দঃ)-এর সম্মানিত পিতার ইস্তিকাল :

নবী করীম (দঃ) এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই। এমন সময় তাঁহার সম্মানিত পিতা আব্দুল্লাহকে তদীয় পিতা আব্দুল মুত্তালিব মদীনা হইতে খেজুর নিয়া আসার নির্দেশ দেন। আব্দুল্লাহ তাঁহাকে গর্ভাবস্থায় রাখিয়া মদীনা চলিয়া যান। ঘটনাক্রমে কয়েকদিনেই তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া যায়। এইভাবে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই পিতৃছায়া হওয়ার মাথার উপর হইতে অপসারিত হইয়া যায়। —মোগলতাই, পৃষ্ঠা ৭

দুগ্ধপান এবং শৈশবকাল :

শিশু মুহাম্মদ (দঃ)-কে প্রথমে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননী এবং ইহার কিছুদিন পরে মাদ্রা লাহাবের দাসী সুওয়াইবা স্তন্যদান করেন। অতঃপর হালীমা সাদিয়া এই পরম সৌভাগ্যের অধিকারিণী হন। —মোগলতাই

আরবের সম্রাজ্য গোত্রসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, শত্রুরা দুগ্ধ পান করাইবার জন্য নিজ সন্তানদিগকে আশেপাশের গ্রামে পাঠাইয়া দেয়। ইহাতে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্য সুন্দররূপে বিকাশ লাভ করিত এবং তাহারা পাণ্ডুর আরবী ভাষাও আয়ত্ত করিয়া নিত। এই কারণেই গ্রামের মহিলারা দুগ্ধপোষা শিশু সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রায়শঃই শহরে গমন করিত।

অপরত হালীমা সাদিয়া (রাঃ) বলেন, “আমি দুগ্ধপোষা শিশুর সন্ধানে বনু সা’দ গোত্রের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে তায়েফ হইতে মক্কায় রওয়ানা হই। সেই বৎসর দেশে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। আমার কোলেও একটি দুগ্ধপোষা শিশু ছিল।

টিকা

* قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم كذا في المواهب - نشر الطيب

একটি রেওয়াজতে এইরূপ আছে যে, নবী করীম (দঃ)-এর জন্মের ৭ মাস পর তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু “যাদুল মা’আদ” গ্রন্থে ইবনে কাইয়িম এই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

কিন্তু (দারিদ্রা ও উপবাসের দরুন) আমার স্তনে এই পরিমাণ দুগ্ধ ছিলনা যাহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। সারারাত সে ক্ষুধায় কাতরাইত আর আমরা তাহার জন্য বসিয়া রাত কাটাইতাম। আমাদের একটি উটনীও ছিল। কিন্তু উহার স্তনেও তখন দুগ্ধ ছিল না।

মক্কার সফরে আমি যে লম্বা কানওয়াল উষ্ট্রীর উপর সওয়ার ছিলাম, উহা এতই দুর্বল ছিল যে, সকলের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে পারিতেছিল না। এইজন্য সাথীগণ বিরক্তি বোধ করিতেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে এই সফর সমাপ্ত হইল।” মক্কা পৌঁছিবার পর যে মহিলাই শিশু মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিত এবং শুনিত যে, তিনি এতীম, তখন কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইত না। (কারণ, তাঁহার পক্ষ হইতে যথেষ্ট পুরস্কার ও সম্মানী পাওয়ার আশা ছিল না।) এইদিকে হালীমার ভাগ্য-তারকা চমকাইতেছিল। দুধের সল্পতা তাঁহার জন্য আশীর্বাদ হইয়া দাঁড়াইল। কেননা, দুধের স্বল্পতা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে শিশু দিতে সম্মত হইতেছিল না।

হালীমা বলেনঃ “আমি আমার স্বামীকে বলিলাম, শূন্য হাতে ফিরিয়া যাওয়া আমার কাছে ভাল ঠেকিতেছে না। এইভাবে ফিরিয়া যাওয়ার চাইতে এই এতীম শিশুটিকে নিয়া যাওয়াই বরং ভাল। আমার স্বামী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।” আর এমনিভাবে তিনি সেই এতীম রত্নটিকে সঙ্গে নিয়া আসিলেন, যাহার কল্যাণে শুধু হালীমার ও আমেনার গৃহই নহে বরং সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত সেই জ্যোতির ছটায় উদ্ভাসিত হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল।

আল্লাহর রহমতে হালীমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল এবং দো-জাহানের সরদার শিশু মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কোলে চলিয়া আসেন। তাঁবুতে ফিরিয়া দুগ্ধ পান করাইতে বসার সঙ্গে সঙ্গে বরকত ও কল্যাণের অজস্র ধারা প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্তনে এত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ নামিয়া আসিল যে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার দুধ-ভাই উভয়েই তৃপ্তি সহকারে পান করিলেন এবং ধুমাইয়া পড়িলেন। এইদিকে উটনীর দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইলেন, উহার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। হালীমা বলেনঃ “আমার স্বামী উটনীর দুগ্ধ দোহন করিয়া আনিলেন এবং আমরা সকলে খুব পরিভূপ্ত হইয়া পান করিলাম আর সারারাত আরামে কাটাইলাম। বহুদিন পর আমাদের জন্য ইহাই ছিল প্রথম রজনী যে, আমরা শান্তিতে মন ভরিয়া ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম। ইহাতে আমার স্বামী আমাকে বলিতে লাগিলেন, ‘হালীমা! তুমি যে অত্যন্ত মোবারক শিশু ঘরে আনিয়াছ!’ আমি বলিলাম, হাঁ, আমারও তাই ধারণা, মুহাম্মদ (দঃ) অতিশয়

মোবারক শিশু। অতঃপর আমরা মফা হতে রওয়ানা হইলাম। আমি শিশু মহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোলে নিয়া সেই দুর্বল দীর্ঘকর্ণের উটনীর উপর আরোহণ করিলাম।

কিন্তু আল্লাহর মহিমার লীলা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম—এখন সেই দুর্বল বাহনটি এত দ্রুত গতিতে চলিতে লাগিল যে, অন্য কাহারো সওয়ারী উহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হইল না। আমার সহযাত্রী মহিলাগণ বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিল : ‘এইটা কি সেই বাহন যাহাতে আরোহণ করিয়া তুমি আসিয়াছিলে?’

যাহোক এইভাবে আমরা বাড়ী পৌঁছিয়া গেলাম। সেখানে তখন চরম দুর্ভিক্ষ বিলাস করিতেছিল। দুগ্ধবতী সমস্ত জীব দুগ্ধ-শূন্য ছিল।

কিন্তু আমি গৃহে প্রবেশ করার সাথে সাথে আমার সব কয়টি বকরীর স্তন দুধে ভরপুর হইয়া উঠিল। এখন হইতে আমার বকরীগুলি প্রত্যহ দুধে পরিপূর্ণ হইয়া ঘরে ফিরিতে লাগিল। অনারা তাহাদের পশুর স্তন হইতে এক ফোঁটা দুধও সংগ্রহ করিতে পারিতেছিল না। আমার গোত্রের লোকেরা তাহাদের রাখালগণকে বলিতে লাগিল, ‘হালীমার বকরীগুলি যে জয়গায় ঘাস খায় তোমরাও সেই চারণ ক্ষেত্রে নিজ নিজ পশুকে ঘাস খাওয়াইতে লইয়া যাইবে।’ কিন্তু তাহারা তো জানে না যে, এখানে কোন চারণভূমি ও মাঠের কোনই বিশেষত্ব ছিল না; বরং অন্য কোন অমূল্য রত্নের মহিমা পদীর অন্তরালে কাজ করিতেছিল; ইহা তাহারা কোথায় পাইতে পারে! সুতরাং একই জয়গায় চরা সত্ত্বেও তাহাদের পশুগুলি দুগ্ধ-শূন্য আর আমার বকরীগুলি দুধে ভরপুর হইয়া বাড়ী ফিরিত। এমনিভাবে আমরা সর্বক্ষণ নবী করীম (দঃ)-এর বরকতসমূহ প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। এভাবেই দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল এবং আমি নবী করীম (দঃ)-এর দুধ ছাড়াইয়া দিলাম।” —আস-সালিহাত নবী করীম (দঃ)-এর প্রথম বাক্য :

হযরত হালীমা বর্ণনা করেন, “যে সময় আমি নবী করীম (দঃ)-এর দুধ ছাড়াইলাম, তখন তাঁহার পবিত্র যবন হইতে এই কয়টি কথা উচ্চারিত হইয়াছিল :

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

আর ইহাই ছিল তাঁহার প্রথম বাক্য। (বায়হাকী ইবনে আক্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—খাসাইসে কুবরা ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫)

নবী করীম (দঃ)-এর দৈহিক ক্রম-বিকাশ অন্যান্য শিশুদের তুলনায় উন্নত ছিল। এমনকি দুই বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বেশ বড়সড় দেখাইতেছিল। এখন আমরা প্রথা অনুযায়ী তাঁহাকে তাঁহার মায়ের কাছে নিয়া গেলাম। কিন্তু তাঁহার বরকতসমূহের

কারণে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিতে মন চাহিতেছিল না। ঘটনাক্রমে সেই বৎসর মক্কায় প্লেগ মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। আমরা মহামারীর অজুহাতে তাঁহাকে ফেরৎ নিয়া আসিলাম। নবী করীম (দঃ) আমাদের কাছেই রহিয়া গেলেন। তিনি ঘরের বাহিরে যাইতেন এবং শিশুদিগকে খেলাধুলা করিতে দেখিতেন, কিন্তু নিজে কখনও খেলাধুলায় অংশ গ্রহণ করিতেন না। একদিন তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার অপর ভাইকে যে সারাদিন দেখিতে পাই না, সে কোথায় থাকে?' আমি বলিলাম : সে বকরী চরাইতে যায়। হুযূর (দঃ) বলিলেন, 'আমাকেও তাহার সঙ্গে পাঠাইবেন'।^১ ইহার পর হইতে তিনি তাঁহার দুধ-ভাই (আব্দুল্লাহ)-এর সঙ্গে বকরী চরাইতে যাইতেন। —খাসা-ইস ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫

একদিন তাঁহারা উভয়ে পশুদের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় আব্দুল্লাহ হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৌড়াইয়া গৃহে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহার পিতাকে বলিল, 'আমার কুরাইশী ভাইকে দুইজন সাদা কপড় পরিহিত লোক শোয়াইয়া তাঁহার পেট চিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি তাহাদিগকে এই অবস্থায়ই ফেলিয়া আসিয়াছি।' আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘাবড়াইয়া মাঠের দিকে দৌড়াইলাম। দেখিতে পাইলাম, মুহাম্মদ (দঃ) বসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু চেহারার রঙ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাছা! তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, 'দুইজন সাদা কপড় পরিহিত লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল এবং আমার পেট চিরিয়া উহার মধ্য হইতে কি যেন খুঁজিয়া বাহির করিল। আমি জানি না ইহা কি ছিল।' আমরা তাঁহাকে ঘরে নিয়া আসিলাম* এবং পরে জনৈক গণকের^২ কাছে নিয়া গেলাম। গণক তাঁহাকে দেখামাত্র স্বীয় আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নিজের বুকের উপর উঠাইয়া লইল আর চিৎকার করিতে লাগিল, "হে আরবের জনগণ! শীঘ্র আস। যে মহা বিপদ অচিরেই তোমাদের উপর ঘনায়মান তাহাকে প্রতিহত কর। যার উপায় এই যে, তোমরা এই শিশুটিকে হত্যা করিয়া ফেল এবং আমাকেও তাঁহার সহিত হত্যা কর। যদি তোমরা তাঁহাকে জীবিত ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে স্মরণ রাখিও, সে তোমাদের দ্বীনকে মিটাইয়া দিবে এবং

টিকা

১. শৈশবকালে এমনতর সাম্য-চেতনা লক্ষণীয় যে, "যখন আমার ভাই কাজ করিতেছে তখন আমি কেন করিব না।"

২. ইসলামের পূর্বে কিছু মানুষ জ্বীন ও শয়তানের সাহায্যে আসমানী খবর এবং গোপন কপাল-বার্তা জানিয়া নিয়া গায়েবী খবরের দাবীদার হইত—তাহারা কাহেন বা গণক নামে পরিচিত ছিল।

* সীরাতে ইবনে হিশাম—হাশিয়া যা-দুল মা'আদ, পৃষ্ঠা ৮০; আল-গায়া, পৃষ্ঠা ৮৯

কেননা এগটি দ্বীনের দিকে তোমাদিগকে আহ্বান করিবে, যাহার কথা তোমরা আজ মনে রাখনাও শ্রবণ কর নাই।”

শ্রদ্ধকের কথা শুনিয়া হালীমা ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে এ হতভাগার পিতা হইতে ছিনাইয়া আনিয়া বলিলেনঃ “তোমার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তোমার নিজের মস্তিষ্কেরই চিকিৎসা করানো উচিত।” এই বলিয়া হালীমা তাঁহাকে ঘোষ্যে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই দ্বিতীয় ঘটনাটি ছয় (৬)-কে তাঁহার পিতা জননীর নিকট ফিরাইয়া দিতে তাহাকে গভীরভাবে উদ্ভুদ্ধ করিল। কেননা, তাঁহার গ্রহণ যথাযথ নিরাপত্তা দিতে পারিতেছিলেন না। —খাসা-ইস

মক্কায়া পৌঁছিয়া যখন নবী করীম (৬)-কে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননীর নিকট সোপর্দ করিলেন, তখন তিনি হালীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ “আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়াছে কি? শাপ্ত ফিরাইয়া আনার কারণ কি?” অনেক পীড়াপীড়ির পর হযরত হালীমাকে সোপর্দ নিকট সমুদয় ঘটনা সবিস্তার বর্ণনা করিতে হইল। তিনি শুনিয়া বলিলেনঃ “তোমারই আমার ছেলের একটি বিশিষ্ট মহিমা রহিয়াছে।” তারপর তিনি গর্ভাবস্থা প্রসঙ্গকালে সংঘটিত সকল বিস্ময়কর ঘটনা শুনাইলেন।”

—ইবনে হিশাম, পৃষ্ঠা ৯

নবী করীম (৬)-এর শ্রদ্ধেয়া জননীর ইস্তেকালঃ

যখন তাঁহার বয়স চার বা ছয় বৎসর, তখন মদীনা হইতে প্রত্যাগমনকালে মক্কায়া নামক স্থানে তাঁহার শ্রদ্ধেয়া জননীও পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। —মোগলতাই, পৃষ্ঠা ১০

বাল্যকাল। বয়স ছয় বৎসর। পিতৃছায়া তো আগেই উঠিয়া গিয়াছিল। মাতৃ-ছায়েও আশ্রয়ও আজ শেষ হইয়া গেল। কিন্তু এই এতীম শিশুটি যে রহ্মতের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হওয়ার প্রতীক্ষায় তিনি তো এই সকল সহায়-সম্বলের মনোপেক্ষা নহেন।

আব্দুল মুত্তালিবের পরলোক গমনঃ

পিতা-মাতার পর তিনি তাঁহার পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। কিন্তু আব্বাহ তাআলার অভিপ্রায় ছিল এই সত্যটুকু তুলিয়া দেয়া হয়, এই বালক শুধু রহ্মতের ক্রোড়েই প্রতিপালিত হইবে। যিনি সকল কার্য-কলাপের আসল নিয়ামক সেই রাব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁহার লালন-পালনের ভারদায়ক হইয়াছেন। যখন তাঁহার বয়স আট বৎসর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, তখন আব্দুল মুত্তালিবও দুনিয়া হইতে বিদায় হইলেন।

নবী করীম (দঃ)-এর সিরিয়া ভ্রমণ :

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবু তালেব তাঁহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি তাঁহারই স্নেহ-ছায়ায় বাস করিতে থাকেন। এমনিভাবে যখন তাঁহার বয়স বার বৎসর দুই মাস দশ দিন পূর্ণ হইল, তখন আবু তালেব বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা করিলেন। নবী করীম ছালাম্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সঙ্গে লইয়া তিনি সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন। পথে তাইমা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করিলেন।

তাঁহার সম্পর্কে জনৈক বিরাট ইহুদী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণী :

তিনি যখন তাইমা নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঘটনাচক্রে একদিন বুহায়রা রাহেব নামক একজন অতি বড় ইহুদী পণ্ডিত তাঁহার পাশ দিয়া গমনকালে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন : “আপনার সঙ্গে যে বালকটি রহিয়াছে সে কে ?” আবু তালেব বলিলেন : “ছেলেটি আমার ভ্রাতৃপুত্র।” বুহায়রা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি তাঁহার প্রতি স্নেহ পোষণ করেন এবং তাঁহার নিরাপত্তা কামনা করেন ?” আবু তালেব বলিলেন, “নিঃসন্দেহে।” তখন যাজক বুহায়রা খোদার নামে শপথ করিয়া বলিলেন, “আপনি যদি ছেলেটিকে সিরিয়া নিয়া যান তাহা হইলে ইহুদীরা তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কারণ, ইনি আল্লাহর সেই নবী যিনি ইহুদী ধর্মকে মিটাইয়া দিবেন। আমি তাঁহার গুণাবলী আসমানী কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।”

ফায়দা : বুহায়রা যোহেতু তাওরাতের অতি বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং তাওরাত কিতাবে নবী করীম (দঃ)-এর আকার-অবয়বের পূর্ণ বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে সেহেতু তিনি নবী করীম (দঃ)-কে দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, ইনিই সেই শেষ নবী যিনি তাওরাতকে রহিত করিবেন এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের রাজত্বের অবসান ঘটাইবেন। সুতরাং বুহায়রার কথায় আবু তালেবের মনে শংকা জাগ্রত হইল। তিনি নবী করীম (দঃ)-কে মক্কায় ফেরত পাঠাইয়া দিলেন।

—মোগলতাস্ট, পৃষ্ঠা ১০

ব্যবসার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণ :

সেই সময় মক্কায় খাদীজা ছিলেন একজন ধনী, বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিধবা মহিলা। যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি বুদ্ধিমান, চতুর ও বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেন, তাহাদের হাতে নিজের বাণিজ্যসম্ভার সমর্পণ করিয়া বলিতেন যে, এগুলি অমুক জায়গায় নিয়া বিক্রয় করিয়া আস। তোমাদিগকেও এত পরিমাণ লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে।

পাদ ৩ তখন পর্যন্ত নবী করীম (দঃ)-এর নবুওতের বিকাশ ঘটে নাই, তবুও সারা নবী নবরীতে তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার সুনাম ছিল। তাঁহার পুত্র-পবিত্র পুত্রের প্রতি প্রতিটি লোকের বিশ্বাস ছিল। তিনি 'আল-আমীন' বা 'অতি বিশ্বাসী' আখ্যায়িত প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার এই সুখ্যাতি আর মহত্বের কথা খাদীজার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি তাঁহার বাবসার দায়িত্বভার নবী করীম (দঃ)-এর উপর অপর্ণ করিয়া তাঁহার বিশ্বস্ততা দ্বারা উপকৃত হইতে ইচ্ছা করিলেন।

তিনি হযূর (দঃ)-এর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যদি আমার আশ্রয়-সস্তার সিরিয়ায় নিয়া যান, তাহা হইলে আমি আমার একটি গোলাম আপনার সহযোগিতার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিব এবং অন্যান্য লোককে যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তদপেক্ষা অধিক দ্বারা আপনার খেদমত করিব। নবী করীম (দঃ) এই হেতু স্বভাবতঃ উচ্চ সাহসী ও প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী ছিলেন, তাই সঙ্গে সঙ্গে এই দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেলেন। হযরত খাদীজার গোলাম মাইসারাকে সঙ্গে নিয়া ১৬ই মিল-হজ্জ তারিখে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করিলেন। সিরিয়ায় গিয়া সমুদয় পণ্য অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত প্রচুর মুনাফায় সেখানে বিক্রয় করিলেন এবং সিরিয়া হইতে অন্যান্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় পৌঁছিয়া আনীত পণ্য খাদীজাকে বুঝাইয়া দিলেন। খাদীজা সেগুলি এখানে বিক্রয় করিলে প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হইল।

সিরিয়ার পথে যখন নবী করীম (দঃ) এক জায়গায় যাত্রা-বিরতি করিয়া আশ্রয় করিতেছিলেন, তখন 'নাস্তুরা' নামক একজন ইহুদী পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে শেষ নবীর যে সকল লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা হুবহু নবী করীম (দঃ)-এর মধ্যে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন। যাজক মাইসারাকে চিনিতে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ "তোমার সঙ্গে এই লোকটি কে?" উত্তরে মাইসারা বলিল, "ইনি পবিত্র মক্কার অধিবাসী কুরাইশ বংশীয় একজন সম্ভ্রান্ত যুবক।" 'নাস্তুরা' বলিলেন, "এই যুবকটি কালে নবী হইবেন।" —মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ১২

হযরত খাদীজার সহিত বিবাহঃ

হযরত খাদীজা ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা। নবী করীম (দঃ)-এর শিষ্টাচার এবং বিশ্বাস্যকর চরিত্র-মাধুর্য প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে মহানবীর প্রতি এক সত্যিকার বিশ্বাস এবং অকৃত্রিম ভালবাসা জন্ম নিয়াছিল। ফলে তিনি স্বয়ং ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, হযূর (দঃ) সম্মত হইলে তিনি তাঁহারই সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবেন।

নবী করীম (দঃ) এর বয়স যখন একুশ^১ বৎসর, তখন হযরত খাদীজার সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় হযরত খাদীজার বয়স ছিল চল্লিশ বৎসর। কোন কোন বর্ণনায় পয়তাল্লিশ বৎসর। —মোগলতাস্ত

বিবাহ অনুষ্ঠানে আবুতালেব এবং বনু-হাশিম ও মুযার গোত্রের সমস্ত নেতৃবর্গ সমবেত হন। আবুতালেব বিবাহের খোৎবা পাঠ করেন। এই খোৎবায় আবুতালেব নবী করীম (দঃ) সম্পর্কে যে কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে ইহার অনুবাদ প্রদত্ত হইলঃ

“ইনি হইতেছেন মুহাম্মদ (দঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ্। যিনি ধন-সম্পদের দিক দিয়া কম হইলেও মহান চরিত্র আর অনুপম গুণাবলীর দরুন যাহাকেই তাঁহার মোকাবেলায় রাখা হইবে, তিনি তাহার চাইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইবেন। কেননা, ধন-সম্পদ এক বিলীয়মান ছায়া আর প্রত্যাবর্তনশীল বস্তু বিশেষ। আর এই মুহাম্মদ (দঃ) যাহার আত্মীয়তার সম্পর্কের খবর আপনাদের সবারই জানা, তিনি খাদীজা বিনতে খোয়াইলাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছেন। তাঁহার সমুদয় মুহরানা মুয়াজ্জাল (নগদ দেয়) হোক কিংবা মু-আজ্জাল (দেবিত্তে দেয়), আমার সম্পদ হইতে দেয়। আল্লাহর কসম, অতঃপর তিনি বিপুলভাবে সম্মানিত ও নন্দিত হইবেন।”

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন মাত্র ২১* বৎসর এবং বাহ্যতঃ তখনও তাঁহাকে নবুওয়ত প্রদান করা হয় নাই, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার সম্পর্কে আবুতালেবের এই বক্তব্য উচ্চারিত হইয়াছিল। তদুপরি অধিকতর বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আবুতালেব তাহার সেই পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর অটল-অবিচল যাহার ধ্বংস সাধনে নবী করীম (দঃ)-এর গোটা জীবন উৎসর্গিত। কিন্তু কথা হইল এই যে, সত্যকে কখনও লুকাইয়া রাখা যায় না।

মোট কথা, হযরত খাদীজার সহিত নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ ২৪ বৎসর তাঁহার সেবায় নিয়োজিত থাকেন। কিছুকাল অহী অবতীর্ণ হইবার পূর্বে আর কিছুকাল অহী অবতীর্ণ হইবার পরে।

টিকা

১০. ঐ সময় নবী করীম (দঃ)-এর বয়স সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যথাঃ ২১, ২৯, ৩০, ৩৭; সীরাতে মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ১৪। সীরাতে মোস্তফা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবাহের সময় নবী করীম (দঃ)-এর বয়স ২৫ বৎসর ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে।

* নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবাহের সময়ের বয়স সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশের মতে তাঁহার বয়স ছিল ২৫ বৎসর।

৫৭১ খাদীজার গর্ভে মহানবীর সন্তান :

৫৭১ খাদীজার গর্ভে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই তনয় সন্তান তার কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। পুত্র তনয়দ্বয়ের নামঃ হযরত কাসেম ও কন্যাঃ ফাতেমা। কাসেমের নামানুসারেই হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কাসেম কাসেম" ডাকনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত কাসেমের নাম আব্দুল্লাহ^১ বলা হইয়াছে। কন্যা চারজনের নামঃ হযরত ফাতেমা, কন্যাঃ যয়নাব, হযরত রোকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুম। হযরত যয়নাব ছিলেন সন্তানগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠা।^২ হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তানগণের সকলেই হযরত খাদীজার গর্ভজাত ছিলেন। অবশ্য তাঁহার তৃতীয় পুত্র কাসেম ইবরাহীমই শুধু হযরত মারিয়া কিবতীয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাসেমের সকলেই বাল্যবয়সেই ওফাৎপ্রাপ্ত হন। অবশ্য হযরত কাসেম (রাঃ) সম্পর্কে কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি সওয়ারীর উপর আরোহণ করিতে পারার মত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। —মোগলতাদ্বি

নবী করীম (দঃ)-এর কন্যাগণ :

হযরত ফাতেমা সর্ব-সম্মতিক্রমে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। তিনি তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন, "ফাতেমা জান্নাতী নারীগণের সর্দার।" পনের বৎসর সাড়ে পাঁচ মাস বয়সে হযরত আলী (রাঃ)-এর মাৎ ও তাঁহার পরিণয় হয়। বিবাহে মোহরানা নির্ধারিত হইয়াছিল চারিশত আশি দিরহাম। এই সাইয়িদাতুন-নিসার যৌতুক ছিল একটি চাদর, খেজুর গাছের তালভরা একটি বালিশ, একটি চামড়ার গদি, একটি দড়ির খাটিয়া, একটি মোশক, দুইটি মাটির কলস, দুইটি সুরাহী এবং একটি আটার চাক্কী। —(তবকাতে ইবনে মা'আদ) চাক্কী পেয়ণসহ ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম তিনি নিজ হাতেই সম্পন্ন করিতেন। এই ছিল দৌ-জাহানের সর্দার খাতিমুল-আস্বিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক আদরের কন্যার বিবাহ, যৌতুক এবং মোহরানার অবস্থা, টিকা

১- যা-দুল মা'আদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তাঁহার আসল নাম ছিল আব্দুল্লাহ। তৈযব ও তাহের এই দুইটি ছিল তাঁহার উপাধি।

২- হাফেজ ইবনে কাইয়্যাম যা-দুল মা'আদ গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত উল্লেখ করিয়াছেন।

৩- কেহ হযরত যয়নাবকে, কেহ হযরত রোকাইয়াকে, কেহ হযরত উম্মে কুলসুমকে সর্বজ্যেষ্ঠা মারিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রোকাইয়া (রাঃ) সর্বজ্যেষ্ঠা এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) সর্বকনিষ্ঠা ছিলেন।

—যা-দুল মা'আদ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫

আর তাহার দারিদ্রপীড়িত জীবনের চিত্র।^১ যে সকল মহিলা বিবাহ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতায় স্নায় দ্বীন ও দুনিয়াকে ধ্বংস করিয়া দেয় তাহারা কি ইহা দেখিয়াও লজ্জা বোধ করিবে না?

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন পুত্র-সন্তান বাঁচিয়া না থাকার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার বিরাট রহস্য নিহিত রহিয়াছে। শুধু কন্যা-সন্তানগণের মাধ্যমেই দুনিয়াতে তাহার বংশ বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু কন্যাগণের মধ্যেও শুধু হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর সন্তানগণই জীবিত ছিলেন। অন্যান্য কন্যাগণের মধ্যে কাহারো কাহারো কোন সন্তানই জন্মায় নাই। আর কাহারো কাহারো সন্তান জীবিত থাকেন নাই।

হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ আবুল আস ইবনুর রবী'-এর সহিত হইয়াছিল। তাহাদের একটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই মৃত্যুবরণ করে। 'উমামা' নামী তাহাদের একটি কন্যা ছিল। হযরত ফাতেমার ইস্তিকালের পর হযরত আলী (রাঃ) ইঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন সন্তান ছিল না।

হযরত রোকহিয়া (রাঃ) ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর সহ-ধর্মিণী। তাহারা এক সঙ্গেই হাবশায় হিজ্রত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় নিঃসন্তান অবস্থায় তাহার ইস্তিকাল হয়। তাহার পর তাহার তৃতীয় ভগ্নী হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ)-কেও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমানের সহিত বিবাহ দেন। এই কারণে হযরত উসমান "যীন-নূরাইন" বা দুই নূরের অধিকারী বলিয়া অভিহিত হইতেন। নবম হিজরীতে হযরত উম্মে কুলসুমও পরলোক গমন করেন। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছিলেন, "যদি আমার তৃতীয় কোন কন্যা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকেও আমি উসমানের সহিত বিবাহ দিতাম।"

—সীরাতে মোগলতাস্তি, পৃষ্ঠা ১৬ ও ১৭

মহিলাগণের জন্য স্মরণীয় :

সীরাতের নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় রহিয়াছে যে, একবার হযরত রোকহিয়া (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-এর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অভিযোগ করিতে আসিলেন। হযরত (রাঃ) বলিলেন,

টিকা

১. হযরত ফাতেমা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে হযরত মাওলানা সাইয়াদ আসগার হোসাইন (রহঃ) রচিত ও কুতুবখানা এমদাদিয়াহ, দেওবন্দ কর্তৃক প্রকাশিত "মেক বীবিয়া" গ্রন্থখানা পাঠ করিতে পারেন। ইহাতে ঈমান সজীব হইবে।

দা পামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবে, ইহা আমার পছন্দ নহে। সোজা নিজের ঘরে
আবুয়া যাও।” ইহাই ছিল কন্যার প্রতি পিতার শিক্ষা। বাহাতে তাহাদের দুনিয়া ও
আখেরাত উভয়ই সুগঠিত হইতে পারে। —ইবনে কাসীর রচিত আওজায়ুস-সিয়ার

অন্যান্য পুণ্যবতী পত্নীগণ

নবী করীম (দঃ) হযরত খাদীজার জীবদ্দশায় অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করেন
নাই। হিজরতের তিন বৎসর পূর্বে যখন তিনি পরলোক গমন করেন এবং নবী
করীম (দঃ)-এর বয়স উন-পঞ্চাশ বৎসরে উপনীত হয়, তখন আরো কতিপয়
পুণ্যবতী মহিলা তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন। বাহাদের পবিত্র নাম ও
নিকাহ পুরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

(২) হযরত সাওদা বিনতে যাম্‌আহ্ (রাঃ), (৩) হযরত আয়েশা (রাঃ),
(৪) হযরত হাফসা (রাঃ), (৫) হযরত য়য়নাব বিনতে খোশাইমা (রাঃ), (৬) হযরত
উম্মে সালামা (রাঃ), (৭) হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ), (৮) হযরত
উয়াইরিয়াহ্ (রাঃ), (৯) হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), (১০) হযরত সুফিয়া (রাঃ),
(১১) হযরত মাইমুনা (রাঃ)। মোট এগার জন। ইহাদের দুইজন ছয়ুর (দঃ)-এর
জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং নয়জন তাঁহার ওফাতের সময় জীবিত
ছিলেন। আর ইহা শুধু নবী করীম (দঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া উম্মাতের ইজমা
এথা একমত রাখিয়াছে। উম্মাতের জন্য একই সময়ে চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা
আদৌ জায়েয নহে। নবী করীম (দঃ)-এর এই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু কারণ
পরিবর্তীতে বর্ণনা করা হইবে।

হযরত সাওদা (রাঃ)ঃ ইনি প্রথমে সাকরান ইবনে আম্বরের সহ-ধর্মিণী ছিলেন।
তাহার পরে ছয়ুর (দঃ)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)ঃ ইনি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর
কন্যা। ছয়ুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার
সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। হিজরী ১ম সনে নয় বৎসর বয়সে তাঁহার
পুণ্যবতী সম্পন্ন হইয়াছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
পশ্চকালের সময় তাঁহার বয়স ছিল আঠার বৎসর। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের এই নয় বৎসরের পবিত্র সান্নিধ্য তাঁহার উপর কি যে প্রভাব বিস্তার
করিয়াছিল এবং এই সীমিত পরিসরে তিনি কত কি যে আয়ত্ত করিতে সক্ষম
হইয়াছিলেন, তাহা বড় বড় সাহাবীগণের বক্তব্য হইতে অনুধাবন করা যায়। তাঁহারা
বর্ণিতেন, “যখন কোন কঠিন সমস্যার ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ সৃষ্টি হইত, তখন

আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীকার নিকট উহার সমাধান পাইতাম।” ঠিক এই কারণে প্রবীণ সাহাবীদের অনেকেই তাঁহার শিষ্য ছিলেন।^১

হযরত হাফসা (রাঃ)ঃ ফারুকে আযম (রাঃ)-এর কন্যা ছিলেন তিনি। প্রথমে উনাইস্ ইবনে হুযাফার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সনে নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে বিবাহ করেন।

হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মা হেলালিয়া (রাঃ)ঃ ইনি “উম্মুল মাসাকীন (মিসকীনদের জননী)” উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। প্রথমে তোফায়ল ইবনে হারেসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তালাক দিলে পরে তাহার ভাই উবায়দার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বদর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করিলে হিজরী তৃতীয় সনে উহুদ যুদ্ধের একমাস পূর্বে নবী করীম (দঃ)-এর সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪৯

হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ)ঃ ইনি হযরত আবু সুফিয়ানের কন্যা। প্রথমে উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহ্শের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উবায়দুল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। স্বামী-স্ত্রী মুসলমান হইয়া হাবশায় হিজরত করিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া উবায়দুল্লাহ্ খৃষ্টান হইয়া যায় এবং উম্মে হাবীবা স্ত্রীয় ঈমান-আকীদার উপর অটল থাকেন। এই সময় নবী করীম (দঃ) হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীকে এই মর্মে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন তাঁহার পক্ষ হইতে উম্মে হাবীবার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন। সুতরাং নাজ্জাশী বিবাহের প্রস্তাব পেশ করেন এবং নিজেই এই বিবাহের অভিভাবক হইয়া মহরানার চারশত দীনার আদায় করিয়া দেন।

হযরত উম্মে সালামা (রাঃ)ঃ তাহার নাম ছিল হিন্দা। প্রথমে আবু সালামার বিবাহাধীনে ছিলেন। আবু সালামার পক্ষ হইতে তাঁহার সন্তানাদিও ছিল। হিজরী ৪র্থ সনের জুমাদাস-সানী মাসে এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী হিজরী তৃতীয় সনে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। (সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫) বলা হইয়া থাকে যে, হযরত উম্মে সালামা সমস্ত পবিত্রা-পবিত্রগণের পরে ইস্তিকাল করিয়াছিলেন।

হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ্ (রাঃ)ঃ তিনি ছিলেন নবী করীম (দঃ)-এর ফুফাত বোন। হুম্বুর (দঃ) তাঁহাকে হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা

টিকা

১- হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিতে হইলে “নেক-বীবিয়া” নামক গ্রন্থখানা পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পারিয়াছিলেন। যায়েদ ছিলেন হযূর (দঃ)-এর আবাদকৃত গোলাম। তিনি তাঁহাকে আপন পোয়া-পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবুও য়েহেতু তাঁহার গায়ে একবার মনোবদনের ছোঁয়া লাগিয়াছিল, তাই হযরত যয়নাব (রাঃ) এই সম্বন্ধ মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী করীম (দঃ)-এর আদেশ মনোমুখার্থে সম্মত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসরকাল তিনি হযরত যায়েদের আশ্রয়ধানে ছিলেন। কিন্তু য়েহেতু মানসিকভাবে বনিবনা ছিল না সেই হেতু তাদের মধ্যে সব সময় মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকিত। এমনকি হযরত যায়েদ (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তালাক প্রদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বুঝাইয়া বিরত রাখিলেন। কিন্তু পরে যখন কোন কিছুতেই বনিবনাও সম্ভব হইল না, তখন হযরত যায়েদ (রাঃ) বাধ্য হইয়া তাঁহাকে তালাক প্রদান করিলেন। ইহার পর হযরত যয়নাবের (রাঃ) মনোবেদনা লাঘব করিবার জন্য হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু য়েহেতু তৎকালীন আরবে পালক-পুত্রকে নিজের ঔরষজাত সন্তানের সমতুল্য বিবেচনা করা হইত সেইহেতু সাধারণ জনমতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করিতে বিরত ছিলেন। পাছে হয়তো লোকেরা এইভাবে সমালোচনা করিতে লাগিবে যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আপন পুত্র-বধুকে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু য়েহেতু ইহা ছিল অন্ধকার যুগের একটি কুসংস্কার মাত্র এবং ইহাকে সমূলে উৎখাত করা ছিল ইসলামের অপরিহার্য দায়িত্ব। সুতরাং কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হইল :

“আপনি কি লোকদিগকে ভয় করিতেছেন? অথচ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা উচিত।” —সূরা-আহযাব

সুতরাং হিজরী ৪র্থ সনে এবং কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ৩য় অথবা ৫ম সনে আল্লাহ পাকের নির্দেশক্রমে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং তাঁহাকে বিবাহ করেন। উদ্দেশ্য ছিল : যেন মানুষ বুঝিতে পারে যে, পালক-পুত্র কখনও ঔরষজাত পুত্রের সমান নহে। পালক পুত্রের স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদের পরে পালক পিতার জন্য হারাম থাকে না। আর যাহারা আল্লাহর এই হালালকে বিশ্বাস অথবা কর্মের দিক দিয়া হারাম করিয়া রাখিয়াছে তাহারা যেন ভবিষ্যতে ভ্রান্তির বেড়া জাল হইতে বাহির হইয়া আসে এবং অন্ধকার যুগের এই কুসংস্কার সমূলে উৎপাটন হইয়া যায়। কিন্তু এই প্রাচীন কুসংস্কারের মূলেৎপাটন শুধু তখনই সম্ভব ছিল যখন নবী করীম (দঃ) স্বয়ং কার্যতঃ ইহার বাস্তবায়ন ঘটাইবেন।

হযরত ময়নাবের পিতা সম্পর্কে আমি যাত্রাবিধ লিখিয়াছি এত অত্যন্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাসমূহের আলোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। সর্হই নোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার হাফিযে হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ফতহুল বারী গ্রন্থে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। (ফতহুল বারী, তফসীরে সূরা-আহযাব।) এই প্রসঙ্গে অন্যান্য যেসব ভ্রান্ত রেওয়ায়ত রটানো হইয়াছে তাহা সবই মুনাফেক ও কাফেরদের অলীক রটনা। কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিকও কোন প্রকার ঘাঁচাই বাছাই না করিয়া তাহা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন—যাহা সর্বৈব মিথ্যা ও স্বকপোল-কল্পিত বৈ কিছুই নহে।

হযরত সুফিয়া বিনতে হোয়াই (রাঃ) : ইনি ছিলেন হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর। ইহা একমাত্র তাঁহারই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি একদিকে একজন নবীর কন্যা এবং অপর দিকে একজন নবীর সহ-ধর্মিণী ছিলেন। প্রথমে কেনানা ইবনে আবিল হাকীকের বিবাহধীনে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করেন।

হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারেস খোয়াইয়া (রাঃ) : বনীল মুস্তালাক গোত্রের সর্দার হারেসের কন্যা ছিলেন। যুদ্ধে বন্দী হইয়া ছয়র (দঃ)-এর খেদমতে নীত হন এবং পরে তাঁহার বিবাহধীনে আসেন। ইহার ফলে তাঁহার গোত্রের সকল লোক মুক্তি লাভ করে এবং তাঁহার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস হেলালিয়া (রাঃ) : ইনি প্রথমে মাসউদ ইবনে উমরের বিবাহধীনে ছিলেন। তিনি তালাক দিলে আবু রেহামের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আবু রেহামের মৃত্যুর পর নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহে আসেন।

—মোগলতান্ত্রিক

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ছিলেন ছয়র (দঃ) এর সর্বশেষ সহ-ধর্মিণী। তাঁহার পরে নবী করীম (দঃ) আর কোন বিবাহ করেন নাই।

উপরোক্ত বিবিগণ ছাড়াও আরো কতিপয় মহিলার সহিত ছয়র (দঃ)-এর বিবাহ সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু ছয়র (দঃ)-এর পবিত্র সাহচর্য তাহাদের নসীব হয় নাই বরং রুখ্‌সাতীর পূর্বেই বিশেষ বিশেষ কারণে বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছিল। ইহার বিশদ বিবরণ সীরাতে বড় বড় কিতাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

নবী করীম (দঃ)-এর বহুবিবাহ সম্পর্কে

প্রয়োজনীয় উপদেশ :

একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা ইসলামের পূর্বেও দুনিয়ার প্রায় সকল ধর্মেই বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইত। আরব, ভারতবর্ষ, ইরান, মিসর, গ্রীক, বাবেল, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে বহু বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল এবং

এই সমাজিক বিলাসের প্রাকৃতিক পয়সামোদায়মান নিয়মটি খাড়া কেই অস্বীকার
করেন। সত্যে না। বর্তমান যুগে উড়নোপের মতোদের প্রভাবের পূর্ব-পুরুষদের
সম্বন্ধে বড়-বিবাহ অবৈধ করার চেষ্টা নবন্যায়ের নিষ্ঠুর উত্থাতে সফলকাম হইতে পারে
নব-অন্যশেষে আভাবিক নীতির জন্য উত্থাতে এবং এখন ইহার প্রচলনকে জনপ্রিয়
করার চেষ্টা চলিতেছে।

সামাজিক স্বাধীন পণ্ডিত মিঃ ডেভিন পোর্ট একাধিক বিবাহের সমর্থনে ইঞ্জিল
সমূহে অনেক আয়াত বর্ণনার পর লিখিতেছেন, “এই আয়াতসমূহ হইতে প্রতীয়মান
হয় যে, বড়-বিবাহ শুধু পছন্দনীয়ই নহে; বরং আল্লাহ তা’আলা ইহাতে বিশেষ
সম্মান ও বন্দোবস্ত দান করিয়াছেন।” —জন ডেভিন পোর্টের জীবনী, পৃষ্ঠা ১৫৮

সামাজিক একাধিক বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, ইসলামের পূর্বে বহু-বিবাহের কোন
সম্মানপারিত ছিল না। এক এক ব্যক্তির আওতায় হাজার হাজার নারী থাকিত।

সামাজিক পাদ্রীরা সব সময়ই বহু-বিবাহে অভ্যস্ত ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত
সামাজিক ইহার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট ও তাহার
সামাজিককরীগণ অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

সামাজিকভাবে বৈদিক আচারে বহু বিবাহ বৈধ ছিল এবং ইহাতে একই সময়ে দশ
সম্রাট, তেরজন ও সাতাশজন করিয়া স্ত্রী রাখার অনুমতি রহিয়াছে।^৬

সামাজিক কথা, ইসলামের পূর্বে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ এক সীমাহীন আকারে প্রচলিত
ছিল। বিভিন্ন ধর্ম ও রাষ্ট্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া যতদূর জানা যায় তাহাতে
সামাজিক হইতে হয় যে, ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু, আর্য এবং পারসিক কোন ধর্ম অথবা বিধানই
সামাজিক কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে নাই।

৬।

সামাজিকভাবে পাদ্রী ফিক্স, জন মিলটন এবং আইজ্যাক টেলরসহ আরো অনেকে অভ্যস্ত
সামাজিক ভাষায় ইহার প্রতি সমর্থন ঘোষণা করিয়াছেন।

সামাজিক বইবেল পাঠে জানা যায় যে, হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর সাতশত স্ত্রী এবং
১০০৩ হেরেম ছিল। (প্রথম সালাতীন ১১/১) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিরানব্বই জন স্ত্রী,
১০০৩ ইবরাহীম (আঃ)-এর তিন স্ত্রী এবং হযরত ইয়াকুব ও মুসা (আঃ)-এর চারজন করিয়া
সামাজিক বিদ্যমান ছিলেন। —বাইবেল, জুধ অধ্যায় ২৯ ও ৩০

১০। মনু যাহাকে হিন্দু এবং আর্যদের সর্বজন স্বীকৃত মনীষী ও নেতা বলিয়া মান্য করা হয়—তিনি
সামাজিক শাস্ত্রে লিখিয়াছেন, “যদি কোন ব্যক্তির চার-পাঁচজন স্ত্রী থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজন
সামাজিকবর্তী হয়, তাহা হইলে অবশিষ্টগণকেও সম্ভাবনবর্তী বলা হয়।” (মনু অধ্যায় ৯, শ্লোক ১৮৩ ;
সামাজিকভাবে তা’আদ্দে আয়ওয়াজ, অমৃতসর।) শ্রী কৃষ্ণ—যাহাকে হিন্দুদের মধ্যে অভ্যস্ত
সামাজিকভাবে অবতার বলিয়া গণ্য করা হয়—তাহার হাজার হাজার স্ত্রী বিদ্যমান ছিল।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এই প্রথা এমনিভাবে সামা নির্ধারণ ছাড়াই প্রচলিত ছিল। কোন কোন সাহাবীর বিবাহে চারজনেরও অধিক স্ত্রী বিদ্যমান ছিল। হযরত খাদীজার ইন্তিকালের পর হযর (দঃ)-এর বিবাহ বন্ধনেও বিশেষ বিশেষ ইসলামী প্রয়োজনে দশজন পর্যন্ত স্ত্রী একত্রিত হইয়াছিলেন।

অতঃপর যখন দেখা গেল যে, এই বহু বিবাহের কারণে মহিলাদের অধিকার খর্ব হইতে চলিয়াছে, কারণঃ লোকেরা প্রথমতঃ লোভের বশবতী হইয়া একাধিক বিবাহ করিত কিন্তু পরে স্ত্রীগণের অধিকার আদায় করিতে সক্ষম হইত না, তখন কুরআনে আযীযের চিরন্তন বিধান যাহা পৃথিবীর বুক হইতে সর্বপ্রকার জুলুম অত্যাচার উৎখাত করার জন্যই অবতীর্ণ হইয়াছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদিও একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নাই, তবে ইহার সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া ইহার অনিষ্ট ও অপকারিতাসমূহের অবসান করিয়া দিয়াছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অবতীর্ণ হইল যে, "এখন তোমরা মাত্র চারজন স্ত্রীলোককে একই সময়ে বিবাহ করিতে পারিবে। তাও এই শর্তে যে, যদি তোমরা চারজন স্ত্রীর অধিকারসমূহ সমান সমানভাবে আদায় করিতে সক্ষম হও। আর যদি সুবিচার ও সমতা বিধান করার সাহস ও ক্ষমতা না থাকে তাহা হইলে একাধিক স্ত্রী রাখা অন্যায ও জুলুম।"

এই ঘোষণার পর একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা সর্ব-সম্মতভাবে হারাম হইয়া গিয়াছে। যে সকল সাহাবীর বিবাহে চারজনের অধিক স্ত্রী ছিল তাঁহারা চারজনকে রাখিয়া অবশিষ্টদেরকে তালাক দিয়া দিলেন। হাদীস শরীফে আছে, হযরত গায়লান যখন মুসলমান হইলেন তখন তাঁহার বিবাহে দশজন স্ত্রী ছিল। রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, চারজনকে রাখিয়া বাকী সকলকে বর্জন কর। এমনিভাবে যখন নওফল ইবনে মুয়াবিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পাঁচজন স্ত্রী ছিল। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের একজনকে বর্জন করার নির্দেশ দিলেন।

—তাক্‌সীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের সংখ্যাও এই সাধারণ আইন অনুযায়ী চারজনের অধিক না থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে ইহাও লক্ষ্যণীয় যে, উম্মুহাতুল মো'মেনীন অন্যান্য মহিলাগণের মত নহেন। কুরআন স্বয়ং ঘোষণা করিতেছে—

টিকা

১০ ইহা এই আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

فَانكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْكَ وَرَبِيعٌ - فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً -

بِنِسَاءِ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

৩ নবীর স্ত্রীগণ! তোমরা অন্যান্য সাধারণ মহিলাদের মত নহ।” হযূর (সঃ) এর পবিত্র পড়িগণ হইতেছেন সকল উম্মতের মাতা। তাঁহারা মহানবীর পর হইতে কাহারও দাম্পত্যে আসিতে পারেন না। এখন যদি সাধারণ বিধানের আওতায় নবী করীম (সঃ)-এর চারজনের অতিরিক্ত অন্যান্য স্ত্রীগণকে তালাক দিয়া পৃথক করা হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের উপর ইহা কতই না অবিচার করা হইত যে, তাহাদের জীবনই তাঁহাদিগকে নিঃসঙ্গ থাকিতে হইত এবং নবী করীম (সঃ)-এর স্ত্রীদিগের সাহচর্য তাঁহাদের জন্য এক বিরাট আযাবে পরিণত হইত। এক দিকে নবী করীম (সঃ)-এর সাহচর্য ছিল হইয়া যাইত আর অপর দিকে অন্য সাধারণ দুঃখ মোচনের অনুমতিও তাহাদের থাকিত না।

সুতরাং নবী-সহধর্মীগণকে এই সাধারণ বিধানের অন্তর্ভুক্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ যে সমস্ত বিবাহ এই কারণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে, তাহাদের স্বামীরা জেহাদের ময়দানে শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পিতৃ-সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশের জন্যই তাঁহাদিগকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এখন যদি তাঁহাদিগকে তালাক দিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা কি হইত! ইহা কেমন সমবেদনা হইত যে, এখন তাঁহারা সারা জীবনের জন্য বিবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেন?

সুতরাং চারজনের অধিক স্ত্রী রাখা শরীঅতের নির্দেশে শুধু নবী করীম (সঃ)-এরই বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত হইল। ইহা ছাড়াও উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সঃ)-এর সাংসারিক জীবনের অবস্থাসমূহ—যাহা উম্মতের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল কর্মকাণ্ডের বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে পরিগণিত—ইহা শুধু তাহাওঁয়াজে মুতাহারাতগণের মাধ্যমেই আমাদের নিকট পৌঁছিতে পারিত এবং ইহা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য যে, নয়জন বিবিও সেই প্রয়োজনের তুলনায় কম।

এই সকল বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন মানুষ কি একথা বলিতে পারে যে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বৈশিষ্ট্য (আল্লাহ্ ক্ষমা করুন) তাহার জৈবিক ভোগ-লালসার উপরে নির্ভরশীল ছিল?

এতদপ্রসঙ্গে এই বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, যখন সমগ্র আরব-অনারব নবী করীম (সঃ)-এর বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, তাঁহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে আঁটিতেছিল, তাঁহার উপর নানান রকম দোষারোপ ও অপবাদ আরোপ করিতেছিল, তাঁহাকে পাগল, মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করিতেছিল—এক কথায়

এই দেদাঁপামান সূর্যের গায়ে ধূলাবালি নিষ্ক্ষেপ করবার জন্য সর্বপ্রকারের প্রাণাশুক চেষ্টা করিয়া নিজেরাই শুধু লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতেছিল। এত কিছু করিতেছিল কিন্তু কোন শত্রুও কি কোন দিন তাঁহার সম্পর্কে জৈবিক ভোগ-লালসা এবং নারী-ঘটিত কোন ব্যাপারে কোন অভিযোগ আরোপ করিতে পারিয়াছিল? না, অবশ্যই না। এই ব্যাপারে মিথ্যা রটনার কোন দুর্বল ভিত্তিও তাহাদের ছিল না। নতুবা কোন মর্যাদাবান লোকের দুর্নাম রটানোর জন্য এতদপেক্ষা বড় মোক্ষম কোন অস্ত্র আর ছিল না। যদি সামান্য মাত্রও অঙ্গুলি রাখিবার অবকাশ থাকিত, তাহা হইলে আরবের কাফেররা যাহাদের কাছে নবীর ঘরের খবর পর্যন্ত গোপন ছিল না—তাহারা সবচাইতে বেশী ফলাও করিয়া ইহাকে তাঁহার দোষ-ত্রুটির মধ্যে গণনা করিত। কিন্তু তাহারা তো এত বোকা ছিল না যে, বাস্তবতা অস্বীকার করিয়া নিজেদের কথার গ্রহণযোগ্যতাকে নস্যাৎ করিয়া দিবে। কেননা, খোদাভীরুতার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন সর্বসাধারণের চোখের সামনে উপস্থিত ছিল। ইহাতে তাহারা দেখিতে পাইতেছিল যে, তাঁহার যৌবনের সিংহভাগ শুধু নির্জনতা ও একাকীত্বের মাঝে অতিবাহিত হইয়াছে। অতঃপর যখন তাঁহার বয়স ২৫ বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন হযরত খাদীজা রাখিআল্লাহু তা'আলা আনহার পক্ষ হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে, যিনি বিধবা ও সন্তানবতী হওয়ার সাথে সাথে জীবনের চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া তখন বার্ধক্যের জীবন যাপন করিতেছিলেন। তিনি নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিবাহের পূর্বে দুইজন স্বামীর সংসার করিয়াছিলেন এবং দুই পুত্র ও তিন কন্যার জননীও ছিলেন।* নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হইতে তাঁহার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। অতঃপর বয়সের বেশীর ভাগই এই এক বিবাহেই অতিবাহিত করেন। আর তাহাও এমনভাবে যে, স্ত্রীকে ঘরে রাখিয়া হেরা পর্বতের নির্জন গুহায় দীর্ঘ এক এক মাস পর্যন্ত শুধু আল্লাহু তা'আলার ইবাদতে নিমগ্ন থাকিতেন। জীবনের একটি বিরাট অংশ এই বিবাহের উপরেই কাটিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার যত সন্তানাদি জন্মিয়াছেন তাহাদের সবাই ছিলেন হযরত খাদীজা (রাঃ)-এরই গর্ভজাত।

অবশ্য হযরত খাদীজার পরলোকগমনের পর যখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশের কোঠা অতিক্রম করে, তখন এই সবকয়টি বিবাহ সংঘটিত হয় এবং বিশেষ বিশেষ শরীয়তী প্রয়োজনের খতিরে দশজন পর্যন্ত মহিলা তাঁহার বিবাহাধীনে আগমন করেন—

টিকা

* সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ১২

সকল সনাতন (হয়ত আয়েশা সিদ্দিকা) নবী করীম (সা.ত.৩) ছিলেন বিধবা আর কেহ
সন্তানহীন হইত।

সকল সনাতন অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি নদাত দারণাও করিতে পারি না যে, কোন
সন্তানহীন সম্প্রদায় লোক নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই
সন্তানহীন (খোদা-পানাত) কোন জৈবিক ভোগ-লালসার পরিণতি বলিয়া মন্তব্য
করিতে পারে! তবে যদি কোন রাতকানা নবুওয়ত-রবির জ্যোতি ও মহাত্ম্যকে
করিতে না পায় এবং নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, কর্ম,
আচরণ, পবিত্রতা, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, তাকওয়া ও পরহেয়গারী এবং
সকল জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিও চোখ বন্ধ করিয়া রাখে, তবুও এই
সন্তানহীন সনাতন সম্প্রদায় ঘটনা প্রবাহই তাহাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে
করিতে পারে যে, এই বিবাহসমূহ নিশ্চয়ই কোন জৈবিক চাহিদা কিংবা ভোগ
পরিণতি হইতে ছিল না। যদি তাহাই হইত, তবে সারাটা জীবন একজন বৃদ্ধার সহিত
সন্তানহীন করিয়া প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সকে এই কাজের জন্য নির্ধারিত করা
কেন মানবের জ্ঞান মানিয়া নিতে পারে না।

আশেখ করিয়া যখন আরবের কাফের ও কুরাইশ-নেতৃবর্গ নবী করীম ছালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইঙ্গিতমাত্র তাহাদের নির্বাচিত সেরা লাভণ্যময়ী সুন্দরীকে
সন্তানহীন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ ছিল। বস্তুতঃ সীরাত ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য
সংসদে ইহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে।

সন্তানহীন তখন খোদ মুসলমানদের সংখ্যাও লাখের কোঠায় পৌঁছিয়া
নাই—খাঁহাদের প্রতিটি নারী নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
সন্তানহীন হইতে পারাকে সঙ্গত কারণেই দৌ-জাহানের সফলতা ও গৌরবের বিষয়
নবী করীম মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত। এইসব কিছু থাকা সত্ত্বেও নবী করীম ছালাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শুধু হযরত খাদীজাই ছিলেন
সন্তানহীন একমাত্র জীবন-সঙ্গিনী—খাঁহার বয়স বিবাহের সময়ই ছিল চল্লিশ বৎসর।
সন্তানহীন ইন্তেকালের পর যে সকল মহিলাকে বিবাহের জন্য নির্বাচিত করা
হইত তাহাদের একজন ব্যতীত সকলেই ছিলেন বিধবা এবং সন্তানের মাতা।
সন্তানহীন অসংখ্য কুমারীদিগকে তখনও নির্বাচন করা হয় নাই।

সন্তানহীন ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নাই। নতুবা দেখাইয়া দেওয়া
হইত যে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বহু-বিবাহ
সন্তানহীনভাবেই ইসলাম ও শরীয়ত সংক্রান্ত প্রয়োজনের উপরেই নির্ভরশীল ছিল।

• যদি নবী-সহধর্মিণীগণ না হইতেন, তাহা হইলে সেইসব আহুকাম যাহা

শুধু মহিলাগণের মাধ্যমেই উম্মাতের নিকট পৌঁছানো সম্ভব ছিল—তাহা অজানাই থাকিয়া যাইত।

নবী করীম (দঃ)-এর বহু-বিবাহকে যদি জৈবিক সম্ভোগ স্পৃহার ফলশ্রুতি বর্ণিয়া আখ্যায়িত করা হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে অত্যন্ত অশালীন ও সত্যঘাতী বিষয়। অনায়াসপ্রীতি যদি কাহারও বুদ্ধি ও বিবেককে অন্ধ করিয়া না দিয়া থাকে, তাহা হইলে কোন কাফেরও এমনটি বলিতে পারে না।

নবী করীম (দঃ) নয়জন পবিত্রা স্ত্রী রাখিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার পবিত্রা স্ত্রীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম হযরত যয়নাব বিন্তে জাহ্শু এবং সর্বশেষে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ইস্তিকাল করেন।

নবী করীম (দঃ)-এর চাচা ও ফুফুগণঃ

আব্দুল মুত্তালিবের দশ পুত্র ছিলেন। যথাঃ (১) হারিস^২, (২) যোবায়ের, (৩) হাযল, (৪) দিরাব, (৫) মুকাওভাম, (৬) আবু লাহাব, (৭) আব্বাস, (৮) হামযা, (৯) আবু তালেব ও (১০) আব্দুল্লাহ। ইহাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ হইলেন নবী করীম (দঃ)-এর পিতা। অবশিষ্ট নয়জন তাঁহার চাচা। হযরত আব্বাস ভাইদের মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠ ছিলেন।

নবী-করীম (দঃ)-এর ছয়জন ফুফু ছিলেন। যথাঃ (১) উম্মায়মা, (২) উম্মে হাকীম, (৩) বাররা, (৪) আতিকা, (৫) সুফিয়া এবং (৬) আরওয়া।

নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারগণঃ

হযরত সা'দ ইবনে মোয়ায (রাঃ) বদর যুদ্ধে, হযরত যাক্‌ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস্ (রাঃ) ও মুহাম্মদ ইবনে সালামা আনসারী (রাঃ) উহুদের যুদ্ধে, হযরত যুবায়র (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে, হযরত আবু আইয়ুব (রাঃ) ও হযরত বেলাল (রাঃ) ওয়াদী কুরা'র যুদ্ধে নবী করীম (দঃ)-এর পাহারাদারীর (দেহরক্ষীর) দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর اللهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ অর্থাৎ, “আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং আপনার হেফযত করিবেন”, আয়াত নাযীল হওয়ার পর হইতে এই দেহরক্ষীর ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়।

টিকা

১. আলহামদু-লিল্লাহ! হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানবনী (রহঃ) এই প্রয়োজনীয়তা এইভাবে পূর্ণ করিয়াছেন যে, পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আয়ওয়াজে মুতাহহারাতের মাধ্যমে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একটি সংকলনে একত্র করিয়াছেন। এই সংকলনের নাম রাখা হইয়াছে تَعْدُدُ الْأَزْوَاجِ لِصَاحِبِ الْمِعْرَاجِ.

২. তাহার নামেই আব্দুল মুত্তালিবের উপনাম “আবুল হারিস” প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কানাগত নির্মাণ ও সর্বসম্মতিক্রমে মতামতবাক্যে
মাধ্যম আদান' সৌকৃতি দেওয়া :

নবী করীম (দঃ) এর বয়স মখন ৩৫ বৎসর তখন কুরাইশরা কাবাগৃহকে নূতন
রীতিতে সংস্কারভাবে নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। বায়তুল্লাহ শরীফের নির্মাণ
কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারাকে প্রতিটি লোকই নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের
স্বপ্ন মনে করিত। এমনকি কুরাইশ বংশের প্রত্যেকটি শাখাগোত্র কাবাগৃহের
নামস্বত্বার্থে কে কাহার চাইতে বেশী অবদান রাখিতে পারে এই প্রতিযোগিতায়
মগ্নমান গ্রহণাছিল। সূতরাং সম্ভাব্য ঝগড়া বিবাদ পরিহার করার উদ্দেশ্যে ইহার
নামস্বত্বার্থকে গোত্রসমূহের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইল।

এই কৰ্ম-বন্টন পদ্ধতিতে কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ 'হাজারে আসওয়াদ'
(কাল পাথর) বসাইবার স্থান পর্যন্ত নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু নির্মাণ
কাজে হাজারে আসওয়াদকে উঠাইয়া উহার নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করার ব্যাপারে
গোত্রসমূহের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দিল। প্রতিটি গোত্র ও ব্যক্তিই এই
কামনাগো অর্জন করিবার জন্য উদগ্রীব ছিল। এমনকি এ ব্যাপারে যুদ্ধের প্রস্তুতি
ও লীগিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন গোত্র-সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ
সম্মেলন-আলোচনার মাধ্যমে একটি আপোষ মীমাংসায় উপনীত হওয়ার সদিচ্ছা
ব্যাখ্যা মসজিদে সমবেত হইলেন।

পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল যে, আগামীকাল্য প্রভূষে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম
নির্দিষ্ট ফটক দিয়া কাবা চত্বরে প্রবেশ করিবেন, তিনি এই ব্যাপারে যে মীমাংসা
করেন তাহা খোদায়ী সমাধান মনে করিয়া সকলেই মানিয়া লইবে।

আল্লাহর মহিমায় দেখা গেল, নবী করীম (দঃ)-ই সর্বপ্রথমে ঐ নির্দিষ্ট ফটক দিয়া
কাবা চত্বরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিল,
"এই আমাদের 'আল-আমীন'—আমরা তাঁহার মীমাংসা মানিয়া নিতে সম্মত।"
নবী করীম (দঃ) আগাইয়া আসিলেন এবং এমন বিচক্ষণতার সহিত সিদ্ধান্ত দিলেন
সকলেই খুশী হইয়া গেল।

অর্থাৎ, তিনি একখানা চাদর বিছাইয়া স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদ (বা কাল
পাথরটি) উহাতে রাখিয়া দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, প্রত্যেক গোত্রের
নির্দিষ্ট ব্যক্তির যেন চাদরের এক এক কোণ ধরিয়া উহার ভীত পর্যন্ত তুলিয়া
ঠিক।

ইহার পূর্বে হযরত শীস্ (আঃ) সর্বপ্রথম কাবাগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন অতঃপর হযরত
ইমাম আলাইহিস্‌সালাম তাহা নির্মাণ করেন।

ধরেন। তাহাই করা হইল। চাদরখানা যখন নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছিল, তখন তখন (দঃ) আপন পবিত্র হাতে পাথরখানা উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করিবার পর লিখিয়াছেন যে, নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই কুরাইশরা একবাক্যে নবী করীম (দঃ)-কে 'আল-আমীন' বা মহা-বিশ্বাসী বলিয়া অভিহিত করিত। —সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৫

নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তিঃ

নবী করীম (দঃ)-এর বয়স যখন ৪০ বৎসর একদিন পূর্ণ হইল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে প্রকাশ্যে ও বাহ্যিকভাবে নবুওয়তের পরম মর্যাদায় ভূষিত করিলেন। তাঁহার নবুওয়ত প্রাপ্তির তারিখও জন্ম তারিখেরই অনুরূপ রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। —সীরাতে মোগলত্বি, পৃষ্ঠা ১৪

পৃথিবীতে ইসলাম প্রচার—

তবলীগের প্রথম পর্যায়ঃ

প্রথমতঃ যখন নবী করীম (দঃ)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট ছিলেন না; বরং তাহাতে শুধু তাঁহার ব্যক্তিগত বিষয়ে বিধি-বিধান থাকিত।

অতঃপর কিছুদিন ওহী আগমন বন্ধ থাকার পর যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পুনরায় তাঁহার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহাকে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হইল। কিন্তু তখন বিশ্বময় ছিল ধর্ম-হীনতা ও পথ-ভ্রষ্টতার জয়জয়কার। বিশেষভাবে আরবদের মিথ্যা অহমিকা এবং পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ-প্রীতি তাহাদিগকে সত্যের ডাকে কর্ণপাত করিবার এতটুকুও অনুমতি দিত না। এইজন্য শুরুতে আল্লাহ পাকের প্রজ্ঞার তাকাদা ছিল নবী করীম (দঃ)-কে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের নির্দেশ না দেওয়া যেন সাধারণ গণ-মানুষ শুরু হইতেই ইসলামের প্রতি বিদ্রোহপরায়া হইয়া না পড়ে। সুতরাং নবী করীম (দঃ) প্রথমতঃ তাঁহার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব এবং যাহাদের প্রতি তাঁহার আস্থা ছিল অথবা আপন দূরদর্শিতার মাধ্যমে যাহাদের মধ্যে পুণ্য ও মঙ্গলের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন।

টিকা

১০ কেননা, বাতেনীভাবে তো নবী করীম (দঃ)-কে সমস্ত নবীদের পূর্বেই নবুওয়ত প্রদান করা হইয়াছিল। —খাসাইসে কুবরা

২০ এই অংশটুকু دروس السيرة المحمدية গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।

এই পবিত্র আশ্রয়স্থানে সর্বপ্রথম তাহার পবিত্র সন্তানগণ হযরত খাদিজা (রাঃ), বাল্য-বন্ধু হযরত আবু বকর (রাঃ), চাচা ও ভাই হযরত আলী (রাঃ) এবং পালক-পুত্র হযরত জা'ফর ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত খাদিজার পূর্ব হইতেই নবী করীম (দঃ)-এর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহার সন্তানগণের বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক পবিত্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সুতরাং নবী করীম (দঃ) তাহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে নিজের রেসালত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কালেমা শাহাদাত পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেলেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁহার গোত্রের মধ্যে সকলের নিকট সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। লোকেরা যাবতীয় ব্যাপারেই তাঁহার উপর আস্থা রাখিত। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি নিজেও সেসব লোককে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করিলেন, তাহাদের মাঝে সত্যতা ও মঙ্গলের নিদর্শন দেখিতে পাইতেন। সুতরাং হযরত আব্বাস (রাঃ), আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), সা'দ ইবনে আবী সালেম (রাঃ), যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রাঃ), তালহা ইবনে উবায়দিল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ লোকেরা তাঁহার ডাকে সাড়া দিলে তিনি তাহাদিগকে মহানবীর খেদমতে নিয়া গেলেন এবং সবাই মুসলমান হইলেন।

এতাদের পর হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রাঃ), উবায়দা ইবনে হারেস (রাঃ), আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ), সাদ্দিদ ইবনে যায়েদ আদভী (রাঃ), আবু সালামা মাদযুনা (রাঃ), খালিদ বিন সাদ্দিদ ইবনুল আস (রাঃ), উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) প্রমুখ হযরত দুই ভাই কুদামাহ্ (রাঃ) ও উবায়দুল্লাহ (রাঃ), আরকাম ইবনে আরকাম (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহাদের সকলেই ছিলেন কুরাইশ বংশের লোক। তাহাদিগের মধ্যে হযরত সুহায়ব রুমী (রাঃ), আশ্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ), আব্দুল গিফারী (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখনও পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ অত্যন্ত গোপনে চলিতেছিল। ইবাদত-বন্দেগী এবং শরীয়তের আচার-অনুষ্ঠানও গোপনেই পালন করা হইত। এমনকি হযরত আবু বকর (রাঃ) পিতাকে এবং পিতা ছেলেকে লুকাইয়া নামায আদায় করিতেন। যখন মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশোর্ধ হইয়া গেল, তখন নবী করীম (দঃ) তাহাদের জন্য নামাযনা বড় ঘর নির্ধারিত করিয়া দিলেন। তাহারা সবাই সেখানে সমবেত হইতেন এবং নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে ইসলামের তালীম দিতেন।

এই পদ্ধতিতে ইসলামের দাওয়াত তিন বৎসর পর্যন্ত চলিয়া ছিল। ততদিনে কুরাইশের এক উল্লেখযোগ্য জামাআত ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গিয়াছেন এবং

ইতিমধ্যে আরো অন্যান্য লোকও ইসলামে দীক্ষিত হইতে শুরু করিয়াছেন, এই সংবাদ সারা মক্কায় ছড়াইয়া পড়ে এবং জনগণের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ইহার আলোচনা হইতে থাকে। এভাবে প্রকাশ্যে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার সময় আসিয়া যায়।

ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত :

তিন বৎসর গোপনে প্রচারের ফলে যখন বিপুল সংখ্যায় নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি বিপুলভাবে আলোচিত হইতে লাগিল, তখন আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (দঃ)-কে প্রকাশ্যে জনগণের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছাইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন।

নবী করীম (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালনে ব্রতী হইলেন এবং মক্কার সাফা পাহাড়ে আরোহন করিয়া কুরাইশের গোত্রসমূহের নাম ধরিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন। যখন সমস্ত গোত্রের লোক জমায়েত হইল, তখন তিনি প্রথমেই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি যদি তোমাদিগকে এইরূপ সংবাদ প্রদান করি যে, শত্রু বাহিনী তোমাদের উপরে চড়াও হওয়ার জন্য ছুটিয়া আসিতেছে এবং অচিরেই তোমাদের উপর লুট-তারাজ শুরু করিবে, তাহা হইলে তোমরা কি আমার সত্যতা স্বীকার করিবে?”

ইহা শুনিয়া সকলেই সম্বরে বলিয়া উঠিল, “অবশ্যই আমরা সবাই আপনার সংবাদকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। কারণ, আমরা আজ পর্যন্ত কখনও আপনাকে মিথ্যা বলিতে দেখি নাই।” ইহার পর হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, “আমি তোমাদিগকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা যদি তোমাদের বাতিল ধর্ম-বিশ্বাস পরিহার না কর তাহা হইলে অচিরেই তোমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার ভয়াবহ শাস্তি নামিয়া আসিবে।” তিনি আরো বলিলেন,

“আমার জানামতে পৃথিবীর কোন মানুষই তাহার জাতির জন্য আমার আনীত উপহার অপেক্ষা উত্তম কোন সওগাত বহন করিয়া আনে নাই। আমি তোমাদের জন্য ইহ-পরকালের কল্যাণ বহিয়া আনিয়াছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ করিয়াছেন, আমি যেন তোমাদিগকে ঐ কল্যাণের প্রতি আহ্বান করি। আল্লাহর কসম! আমি যদি সারা-পৃথিবীর মানুষের নিকট মিথ্যা বলিতাম, তবুও তোমাদের সম্মুখে মিথ্যা বলিতাম না। আর যদি সারা বিশ্বকে ধোঁকা দিতাম, তবুও তোমাদিগকে ধোঁকা দিতাম না। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি একক এবং যাহার

টিকা

১০ পবিত্র কুরআনের আয়াত **فَاعْزُدْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ غِنِ الْمُشْرِكِينَ** এর মর্মার্থ ইহাই।

মান শরীক নাই— আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং সারা বিশ্ববাসীর
সাধারণভাবে আল্লাহর রাসূল ও সংবাদ-বাহক হইয়া আগমন করিয়াছি।”

—দুরুসুস্-সীরাতে, পৃষ্ঠা ১০

আরবের শত্রুতার মুখে

নবী করীম (দঃ)-এর দৃঢ়তা :

৩৩ দাওয়াত ও তাবলীগের ধারা এমনিভাবে অব্যাহত ছিল। আরবরা যখন
আল্লাহের পাবলিক প্যাপার পাবলিক প্যাপার পারিল যে, নবী করীম (দঃ)-এর ওহীতে তাহাদের মূর্তিসমূহের রহস্য
খোঁসিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মূর্তি-পূজারীদের নির্বুদ্ধিতা ব্যক্ত করা
হইয়াছে, তখন তাহারা নবী করীম (দঃ)-এর সহিত শত্রুতায় অবতীর্ণ হইল।
তাহাদের একটি দল তাঁহার পিতৃব্য আবু তালেবের নিকট আসিয়া দাবী জানাইল,
আপনি তাঁহাকে এই ধরনের কথা বলা হইতে বিরত রাখেন অথবা তাঁহার সাহায্য
সহযোগিতা পরিহার করেন।

আবু তালেব সুকৌশলে তাহাদিগকে উত্তর দিয়া বিদায় করিলেন। নবী করীম
এইভাবে সতের বাণীর প্রসার ও প্রচারের কাজ বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার
সাথে চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং মূর্তি পূজা হইতে জনগণকে বাধা দিতে
লাগিলেন। আরবরা আশ্চর্য হইয়া পুনরায় আবু তালেবের নিকট আসিল এবং
কঠোর ভাষায় তাহার নিকট দাবী জানাইল যে, “আপনি আপনার
সহযোগকে বিরত রাখুন। অন্যথায় আমরা সম্মিলিতভাবে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে
সংগ্রাম হইব যতক্ষণ না দুইদলের একদল ধ্বংস হইয়া যাইবে।”

আরব জাতির বিরুদ্ধে

নবী করীম (দঃ)-এর উত্তর :

এবার আবু তালেবও চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। তিনি নবী করীম (দঃ)-এর সহিত
আল্লাহের প্যাপারে আলোচনা করিলেন। হযর (দঃ) বলিলেন,

“হে মাননীয় চাচাজান! আল্লাহর কসম! আরবের পৌত্তলিকরা যদি আমার ডান
হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রাখিয়াও আমাকে আল্লাহর কালেমা তাঁহার সৃষ্টির নিকট
পৌঁছানো হইতে বিরত থাকিতে বলে, তথাপি কখনও আমি ইহা মানিয়া নিতে প্রস্তুত
নহি। যতক্ষণ না আল্লাহর সত্য দীন মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করিবে অথবা আমি
নিজে এই সংগ্রামে আমার জীবন বিলাইয়া দিব।”

আবু তালেব নবী করীম (দঃ)-এর এহেন দৃঢ় প্রত্যয় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,
আচ্ছা যাও। তুমি তোমার নিজের কাজ চালাইয়া যাইতে থাক। আমিও তোমার
সহযোগিতা হইতে কখনও হস্ত সংকোচিত করিব না।”

জনগণের মাঝে ঘনা ছড়ানো ও ইহার বিপরীত ফল :

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল যে, বনী-হাশিম ও বনী আব্দুল মুত্তালিব তাঁহার সাথে রহিয়াছে এবং এই দিকে হজ্জের মওসুমও ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই সুযোগে হুযুর (দঃ) ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালাইবেন। তাঁহার সত্যভাষণের চুম্বকাকর্ষণের ব্যাপারে সকলেই অবগত ছিল। সুতরাং তাহাদের মনে আশঙ্কা দেখা দিল যে, এইবার মুহাম্মদ (দঃ)-এর দীন হয়তো সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়াইয়া পড়িবে। অতএব, তাহারা সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করিল যে, মক্কার সমস্ত রাস্তায় তাহাদের নিজস্ব লোক বসাইয়া দিতে হইবে যাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হইতে হজ্জ উপলক্ষে যে সব লোক আগমন করিবে দূরে থাকিতেই তাহাদিগকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া যায় যে, এখানে একজন যাদুকর রহিয়াছে যে তাহার কথার মাধ্যমে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়; তোমরা ভুলিয়াও তাহার নিকটে যাইও না। কিন্তু—

جرارے راکہ ایزد برفروزد ÷ کسی کش تف زند ریش بسوز

“যে বাতিটি জ্বলে ওরে

আদেশ বলে খোদবিধাতার,

সে বাতি যে নেভাতে চায়

দাড়িই কেবল পুড়ে তাহার!”

আল্লাহর মহিমায় তাহাদের এই কর্মপন্থা প্রকারান্তরে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের পক্ষেই কাজ করিল। যদি তাহারা এমনটি না করিত, তাহা হইলে এমনও হইতে পারিত যে, বহু লোক হয়তো তাঁহার কোন আলোচনাই শুনিত না। কিন্তু তাহাদের এই প্রচেষ্টা প্রত্যেকটি লোককে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তুলিল।

কুরাইশদের নির্যাতন ও তাঁহার দৃঢ়তা :

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল, তাহাদের প্রতিটি পদক্ষেপই বিফল হইতেছে এবং তাঁহার দাওয়াতের কাজ দিনের পর দিন ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে আর লোকজন বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইতেছে, তখন তাহারা তাঁহাকে

টিকা

১০ জাহেলিয়াতের যুগেও হজ্জের প্রচলন ছিল। মক্কার মুশরেকরাও হজ্জপালন করিত। কিন্তু তাহা করিত তাহাদের মনগড়া বাতিল পন্থায়।

মানুষকে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা মক্কার কতিপয় লম্পটকে
করিয়া প্রত্যেকটি বৈঠক-সমাবেশে তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করিতে এবং যে
পন্থায় তাঁহাকে কষ্ট দিতে উদ্বুদ্ধ করিল।

এই নবী করীম (দঃ)-এর হত্যা পরিকল্পনা এবং

তাহার প্রকৃষ্ট মো'জেযা :

একদা নবী করীম (দঃ) কা'বাচত্বরে নামায পড়িতেছিলেন। যখন তিনি সিজদায়
সম্মত, তখন আবু জাহ্ল ইহাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করিয়া তাঁহার পবিত্র মস্তক
কিছু নিক্ষেপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে মনস্থ করিল। কিন্তু—

دشمن اگر قویست نگهبان قوی ترست

“শত্রুতব শক্তিশালী

ভয় জাগিছে তাই?

প্রভু কিন্তু তারও অধিক

শক্তি রাখেন ভাই।”

সুতরাং আবু জাহ্ল পাথর লইয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মস্তকবর্তী হইলেন তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, পাথর হাত হইতে পড়িয়া গেল,
তাহারা ফাকাশে হইয়া গেল এবং সে দৌড়াইয়া তাহার নিজদলে ফিরিয়া গিয়া
লাগিল, “আমি যখন মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মস্তকের
হাত বাড়াইতে ইচ্ছা করিলাম, তখন একটি বিকটাকৃতির উট মুখ ব্যাদান
করিয়া আমার দিকে ধাবিত হইল এবং আমাকে গিলিয়া খাইতে উদাত হইল! এমন
কিছু উট আমি অদ্যাবধি কখনও দেখি নাই!”

ইহা ছিল সেই ঘটনা যাহা কাফেরদের ভরা-মজলিসে সকালের সম্মুখে সংঘটিত
হইল এবং স্বয়ং কাফের সর্দার আবু জাহ্ল তাহা স্বীকার করে।

আবু জাহ্ল, উকবা ইবনে আবি মুয়াহিত, আবু লাহাব, আস্ ইবনে ওয়াইল,
আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুস্, আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব, অলীদ ইবনে
নগীর, নাযার ইবনে হারেস প্রভৃতি কাফের সর্বক্ষণ ছয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁহার পেছনে লাগিয়া থাকিত। ইহাদের
সহায়তায় ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয় নাই; বরং ইহাদের সব কয়জনই
শত্রুতাপমানিত ও লাঞ্চিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কেহ কেহ বদর যুদ্ধে
সহকারীর আঘাতে আর কেহ কেহ নেহাৎ বিশ্রী ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া
মৃত্যু গলিয়া শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে।

মহানবীর প্রতি কুরাইশদের প্রলোভন ও তাঁহার উত্তর :

কুরাইশরা যখন দেখিল, তাহাদের কোন কলা-কৌশলই কার্যকরী হইবার নহে, তখন তাহারা পরামর্শক্রমে স্থির করিল, তাহারা তাহাদের সবচাইতে চতুর সর্দার উতবা ইবনে রবীয়াকে নবী করীম (দঃ)-এর নিকট প্রেরণ করিবে। সে তাঁহাকে সকল প্রকার পার্থিব প্রলোভনে বশ করিতে চেষ্টা করিবে। হয়তোবা তিনি এই ফাঁদে ধরা দিবেন এবং তাঁহার ইসলাম প্রচারে বিরত থাকিবেন।

উতবা যখন ছুয়ূর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল, তখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেছিলেন। সে নিকটে গিয়া বলিতে লাগিল, “ভাতিজা! তুমি সামাজিক মর্যাদা এবং বংশ কৌলিগো আমাদের সকলের চাইতে উত্তম। এতদসত্ত্বেও তুমি তোমার গোত্রের মধ্যে পারম্পরিক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছ, তাহাদিগকে এবং তাহাদের দেব-দেবীকে গালমন্দ দিয়াছ, তাহাদের পূর্ব-পুরুষকে মূর্থ প্রতিপন্ন করিয়াছ। তুমি আজ তোমার মনের আসল কথাটি খুলিয়া বল। তোমার এইসব কাহিনীর আসল উদ্দেশ্য যদি বিপুল ধন-রত্নের অধিকার লাভ করা হইয়া থাকে, তবে আমরা তোমার জন্য এত প্রচুর ধন-সম্পদ যোগাড় করিয়া দিতে প্রস্তুত যে, তুমি মক্কার সবচাইতে বড় ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হইয়া যাইবে। আর যদি তোমার বাসনা এই হইয়া থাকে যে, তুমি একজন বড় নেতা হইবে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে সমগ্র কুরাইশ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা বানাওয়া দিব। তোমার আদেশ ব্যতিরেকে কনাটিও আমরা নাড়াইব না। আর তোমার উদ্দেশ্য যদি বাদশাহী লাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তোমাকে আমাদের বাদশাহও বানাইতে পারি। পক্ষান্তরে (খোদা না করুক) যদি তোমার উপরে কোন জ্বীনের প্রভাব থাকিয়া থাকে এবং যেসব কথা মানুষকে পড়িয়া শুনাইতেছ তাহা তাহারই কথা হইয়া থাকে, অথচ ‘তুমি তাহার’ হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছ—তাহা হইলে আমরা তোমার জন্য একজন চিকিৎসক তালাশ করিব—যে তোমাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে।” —সীরাতে মোগলতঙ্গ, পৃষ্ঠা ২০

উতবা তাহার বক্তব্য শেষ করিলে, নবী করীম (দঃ) তাহার উত্তরে কুরআনের মাত্র একটি সূরা তেলাওয়াত করিয়া শুনাইয়া দিলেন। যাহা শুনিয়া উতবা হতভম্ব হইয়া গেল এবং নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “খোদার কসম! আজ আমি এমন কালাম শুনিয়াছি যেমনটি ইতিপূর্বে আমার সারা জীবনেও শুনি নাই। খোদার কসম! ইহা না কোন কবিতা, না কোন গণকের বাক্য আর নাইবা কোন যাদুমন্ত্র। আমার পরামর্শ হইল এই যে, তোমরা এই লোকটির [মুহাম্মদ (দঃ)] উৎপীড়ন হইতে বিরত থাক। কেননা আমি তাঁহার যে কালাম শ্রবণ করিয়াছি,

সাহিত্যিক নসম। ইত্যন সুনহান মগাদ শাখা নিবারণ হইবে! আমি তোমাদের
 হি সনাতন। তোমরা আমার কথা শুনা। (আন যদি বড় একটা মানিতে নাই চাও,
 তাহা হইলে) অন্তঃকাল নিশ্চিন্দা অপেক্ষা ননা। যদি আরবেয়া বিজয়ী হইয়া যায়, তবে
 তাহা পারিশ্রমেই তোমরা এই আপদের হাত হইতে পরিব্রাণ পাইয়া যাইবে।
 অন্যথ্যে যদি সে আরবেদের উপর বিজয়ী হয় তাহা হইলে তাঁহার সম্মান
 তোমাদেরই সম্মান। কারণ, সে তো আমাদেরই বংশের লোক।”

কুরাইশরা তাহাদের সব চাইতে চতুর সর্দারের এই সকল কথা শুনিয়া অবা-
 কসমা গেল এবং এই বলিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিল যে, এই লোকটিকে মুহাম্মদ (দঃ)
 কব করিয়া ফেলিয়াছে। —দুরুসুস-সীরাতে, পৃষ্ঠা ১৪

যখন তাহাদের কোন চলই কাজে আসিল না, তখন কুরাইশরা নবী করীম
 (দঃ) এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সাহাবীগণ এবং ঘনিষ্ট আত্মীয়-পরিজনের প্রতিও
 ক্রোধের নির্যাতন চালাইতে শুরু করিল। হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীর
 উপর অকথ্য নির্যাতন করা হইল। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শ্রদ্ধেয়া
 স্নানকে এই কারণেই অত্যন্ত নির্দয়ভাবে শহীদ করা হইল। ইসলামের ইতিহাসে
 এই সর্বপ্রথম শাহাদতের ঘটনা। —সীরাতে মোগলতাই, পৃষ্ঠা ২০

সাহাবাদের প্রতি হাবশায় হিজরতের নির্দেশঃ

ত্বয়ে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সর্বপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন
 সাহাবাদের সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার সাহাবা ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত এই
 নির্যাতনের ধারা সম্প্রসারিত হইল এবং দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা অত্যন্ত
 কষ্টের সহিত সমস্ত জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন তবু সেই
 কষ্টের বাণী ও নূরে এলাহী হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে রাজী নহেন যাহা তাহারা
 তাহার মাধ্যমে লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরতের
 প্রণয়িত প্রদান করিলেন।

সুতরাং নবুওয়তের পঞ্চম বৎসরের রজব মাসে ১২ জন পুরুষ^১ এবং ৪ জন
 মহিলা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হযরত উসমান (রাঃ) এবং
 তাহার স্ত্রী হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। —দুরুসুস-সীরাতে, পৃষ্ঠা ১৫

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশী^২ এই মুহাজেরগণের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন
 করেন। তাঁহারা সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন
 টিকা

১. সীরাতে মোগলতাই, পৃষ্ঠা ২১। মুহাজেরগণের সংখ্যার ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মত রহিয়াছে।

২. হাবশার বাদশাহগণকে নাজ্জাশী বলা হইত। —মোগলতাই

কুরাইশরা এই সংবাদ জানিতে পারিল তখন তাহারা আমার ইবনে আস্ আর আব্দুল্লাহ ইবনে রবীয়াকে নাজ্জাশীর নিকট এই বলিয়া পাঠাইল যে, এই লোকগুলি দুষ্কৃতিকারী। তাহাদিগকে নিজের রাজ্যে স্থান দিবেন না, বরং ইহাদিগকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

নাজ্জাশী ছিলেন একজন বিচক্ষণ লোক। তিনি তাহাদের উত্তরে বলিলেন, “আমি তাহাদের মতাদর্শ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে তদন্ত না করিয়া এই কাজটি করিতে পারি না।” অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা তোমাদের ধর্মমত ও ইহার সত্য সত্য ঘটনাসমূহ বর্ণনা কর। তখন হযরত জাফর ইবনে আবি-তালিব^১ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “হে বাহশাহ! আমরা ইতিপূর্বে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। মূর্তিদের পূজা করিতাম এবং মৃতজন্তু ভক্ষণ করিতাম। বাভিচার, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা এবং দুশ্চরিত্রতায় লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সবলরা দুর্বলকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের নিকট একজন রাসুল পাঠাইলেন—যিনি আমাদেরই বংশের লোক। আমরা তাঁহার বংশ ও সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে সবিশেষ অবগত। তিনি আমাদেরই এই আহ্বান জানাইলেন যে আমরা আল্লাহ্কে এক বলিয়া বিশ্বাস করি, কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক না করি, মূর্তি-পূজা ত্যাগ করি, সত্য কথা বলি, আত্মীয়স্বজনদের সহিত সু-সম্পর্ক বজায় রাখি এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করি। তিনি আমাদেরই নিষিদ্ধ মহিলাদের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে নিষেধ করিলেন। খুন-খারাবী, মিথ্যাবলা এবং এতীমের মাল ভক্ষণে বারণ করিলেন। তিনি আমাদেরই নামায়, রোযা, যাকাত এবং হজ্জ সম্পাদন করিবার নির্দেশ দেন। আমরা এইসব কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি।

নাজ্জাশী^২ এই ভাষণ শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কুরাইশী দূতগণকে ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজে মুসলমান হইয়া গেলেন।

টিকা

১. ইউরোপের কোন কোন রাজনীতিবিদ (সম্ভবতঃ লর্ড ক্রোমার) বলিয়াছেন, “যদি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমস্ত আলোম একত্রিত হইয়া দ্বীন-ইসলামের হাকীকত বর্ণনা করিতে চাহেন তাহা হইলে হাবশার মুহাজ্জেরগণ যেমনটি বর্ণনা করিয়াছেন তাহার চাইতে উত্তম বর্ণনা প্রদান করিতে সক্ষম হইবেন না।” —দুরূসুত-তারীখ. পৃষ্ঠা ২১

২. এই নাজ্জাশী অন্য আরো কোন ব্যক্তি হইবেন— যিনি নবুওয়তের পঞ্চম বর্ষে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আসহামা নামক নাজ্জাশী—যাহার ষষ্ঠ হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণের বিবরণ পরে বর্ণিত হইতে যাইতেছে—তিনি অন্য ব্যক্তি।

মহাজেরগণ প্রায় তিন মাস কাল সেখানে শান্তি ও নিরাপদে বাস করিয়া (মক্কায়) ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় হযরত ফারুককে আজমও (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর দো'আর বরকতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তখন পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন নারীর বেশী ছিল না।^১ ফারুককে আজম হযরত ফারুক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের মনে এক প্রকার শক্তি ও সৌর্য মনোভাবিত হইল এবং যে সকল লোক সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণের কল্যাণে ইসলামের প্রাণ্ডবতাকে মনেপ্রাণে স্বীকার করিয়া লওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে প্রতিদিন নিজেদের ইসলামকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। এমনিভাবে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ইসলাম প্রসারিত ও উন্নতি প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

কুরাইশরা যখন দেখিতে পাইল যে, নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার সাহাবাগণের সম্মান ও মর্যাদা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এমনি কি আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাঞ্জাশীও মুসলমানদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাহারা নিজেদের পরিণতি সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া পড়িল।

কুরাইশরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল যে, বনী-হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের নিকট দাবী করা হউক যে—তাহারা তাহাদের ভ্রাতৃপুত্র (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আমাদের হাতে তুলিয়া দিক। অন্যথায় আমরা তাহাদের সহিত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করিব।

কিন্তু বনী আব্দুল মুত্তালিব তাহাদের এই দাবী মঞ্জুর করিল না। তখন কুরাইশরা সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই অঙ্গীকারনামা^২ প্রণয়ন করিল যে, বনী হাশেম ও বনী আব্দুল মুত্তালিবের সহিত পূর্ণাঙ্গ সম্পর্ক ছিন্ন করা হইবে। আত্মীয়তা, বিবাহ-শাদী, ক্রয়-বিক্রয় সবকিছু বন্ধ থাকিবে। অতঃপর এই অঙ্গীকারনামা সাহাবাগণের অভ্যন্তরে বুলাইয়া রাখা হইল।

এক পাহাড়ের উপত্যকায় নবী করীম (দঃ) ও তাঁহার সকল বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-প্রজনকে বন্দী করা হইল। এই সময় একমাত্র আবু লাহাব বাতীত সমস্ত বনী হাশেম এবং বনী আব্দুল মুত্তালিবের সমস্ত লোক মুসলিম ও কাফের নির্বিশেষে সবাই আবু তালেবের সাথে ছিল এবং ঐ উপত্যকায় বন্দী ও অবরুদ্ধ জীবন যাপন করে।

টিকা

১. দুরসুত-তারীখুল ইসলামী, পৃষ্ঠা ২২

২. এই অঙ্গীকারনামা মানসুর ইবনে ইকরামা লিখিয়াছিল এবং ইহার পরিণতিতে তাহার হাত দবশ হইয়া গিয়াছিল। —সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ২৪

সর্বাদিক হইতে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ ছিল। পানাহারের যে সমস্ত দ্রব্য সঙ্গে ছিল তাহাও কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন কঠিন দুর্ভাবনা শুরু হইল। ক্ষুধার তাড়নায় গাছের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হইল।

এই ভয়াবহ অবস্থা দর্শন করিয়া নবী করীম (দঃ) তাঁহার সাহাবাগণকে দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। এইবার ৮৩জন পুরুষ এবং ১২ জন নারীর^১ এক বিরাট দল হিজরতে অংশ গ্রহণ করিলেন। ইহাদের সহিত হযরত আবু মুসা আশ্‌আরী (রাঃ) এবং তাঁহার গোষ্ঠীর লোকজন সহ ইয়ামেনের মুসলমানগণও যোগ দিয়াছিলেন।

এই দিকে নবী করীম (দঃ) এবং তাঁহার অবশিষ্ট পরিবার পরিজন ও সাহাবায়ে কেবাম সুদীর্ঘ তিন বৎসর^২ এই জুলুম অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্টে কালাতিপাত করেন। ইহার পর কিছু সংখ্যক লোক এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে এবং নবী করীম (দঃ)-এর উপর হইতে এই অবরোধ তুলিয়া দিতে উদ্যোগী হইলেন। ঐদিকে নবী করীম (দঃ)-কে অহীর মাধ্যমে অবহিত করা হইল যে, কুরাইশদের অঙ্গীকারনামা উই পোকায় খাইয়া ফেলিয়াছে এবং আল্লাহর নাম বাতীত ইহার কোন অক্ষরই আর অক্ষত নাই। হযূর (দঃ) তাহা লোকজনকে জানাইয়া দিলেন। দেখা গেল— অঙ্গীকারনামার অবস্থা তাহাই হইয়াছে, যেমনটি হযূর (দঃ) বলিয়াছেন। অবশেষে নবী করীম (দঃ)-এর উপর হইতে অবরোধ তুলিয়া লওয়া হইল।

তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (রাঃ)

এর ইসলাম গ্রহণ :

এই সময়ে হযরত তোফায়েল ইবনে আমর দূসী (যিনি নেহাৎ শরীফ এবং আপন গোত্রের নেতা ছিলেন) নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আগমন করিলেন এবং ইসলামের প্রকাশ্য সত্যতার নিদর্শন আর হযূর (দঃ)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য অবলোকন করিয়া স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গেলেন। তারপর আরম্ভ করিলেন : “হে আল্লাহর রাসুল! আমার গোষ্ঠীর লোকেরা আমার কথা মানা করে। আমি বাড়ী ফিরিয়া তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিব। কিন্তু আপনি আল্লাহর কাছে আমার জন্য দো'আ করুন যেন আমার সহিত এমন কোন স্পষ্ট নিদর্শন প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়, যদ্বারা আমি তাহাদিগকে আমার দাবীর সপক্ষে

টিকা

১. সীরাতে মোগলতঙ্গ, পৃষ্ঠা ২৪

২. কোন রেওয়াজতে দুই বৎসর এবং কোন কোন রেওয়াজতে কয়েক বৎসরের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

নিশ্বাস স্থাপন করাইতে পারি। ছয়র (দঃ) দো'আ করিলেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাহার ললাটের উপর এমন একটি নূর চমকাইয়া দিলেন যাহা অদৃশ্যকালে উজ্জ্বল প্রদীপের মত জ্বলজ্বল করিত। যখন তিনি তাহার গোত্রের কাছাকাছি পৌঁছিলেন, তখন খেয়াল হইল যে, তাহার গোত্রের লোকেরা পাছে হয়তো ইহাকে একটি বিপদ বা রোগ মনে না করিয়া বসে এবং ইহা না বলিয়া বসে যে, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাহার মধ্যে এই অভিশাপ চাপিয়া বসিয়াছে, এইজন্য দো'আ করিলেন যে, এই নূরটি যেন তাহার লাঠিতে চলিয়া আসে। আল্লাহ তা'আলা তাহার দো'আ কবুল করিলেন এবং তাহার ললাটের নূরকে তাহার লাঠির মধ্যে বালস্ত লণ্ঠনের মত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আপন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়া ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। কিছু সংখ্যক লোক তাহার চেষ্টায় মুসলমান হইলেন বটে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা তাহার ধারণা মোতাবেক যথেষ্ট ছিল না। এইজন্য তিনি নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাহার চেষ্টায় সফলকাম হইবার জন্য দো'আর আবেদন জানাইলেন। ছয়র (দঃ) দো'আ করিলেন এবং বলিলেন, “যাও, প্রচার কর এবং নস্রত বজায় রাখ।” তোফায়েল ফিরিয়া গেলেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত হইলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে এইবার এমন সফলকাম হইলেন যে, খন্দক যুদ্ধের পরে ৭০/৮০টি পরিবারকে মুসলমান বানাইয়া খায়বারের যুদ্ধের সময় নিজের সঙ্গে করিয়া আনিলেন এবং সবাই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিলেন।

—সীরাতে মোগলতাস্তি—কৃত হাফেজ আলাউদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫

আবু তালেবের ওফাত :

ঐ সময় নবী করীম (দঃ)-এর চাচা আবু তালেবের^২ ইস্তিকাল হয়। এই বেদনাদায়ক ঘটনা নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের মাঝামাঝি সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার তিন দিন^২ পর হযরত খাদীজাও পরলোকগমন করেন। এই কারণে ছয়র (দঃ) এই বৎসরকে শোকের বৎসর^৩ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

—সীরাতে মোগলতাস্তি, পৃষ্ঠা ৩০

টিকা

১. সীরাতে মোগলতাস্তি, পৃষ্ঠা ২৫

২. ইস্তিকালের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। যেমনঃ ৫ই রমযান, হিজরতের ৫ বৎসর পূর্বে, হিজরতের ৪ বৎসর পূর্বে, মেরাজের পরে ইত্যাদি। —সীরাতে মোগলতাস্তি, পৃষ্ঠা ২৬

৩. এই বৎসরই হযরত সওদা (রাঃ)-এর সহিত নবী করীম (দঃ)-এর বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল। মতান্তরে হযরত আয়েশার (রাঃ) পরে তাহার সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

—সীরাতে মোগলতাস্তি, পৃষ্ঠা ২৬

হিজরতে তায়েফ :

আবু তালেবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবী করীম (দঃ)-এর উপর নির্যাতন চালানোর সুযোগ পাইয়া গেল। সুতরাং ছয়র (দঃ)-কে নির্যাতনের কোন পন্থাই তাহারা আর বাকী রাখিল না। যখন মক্কাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশ হইয়া পড়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হইতে লাগিল, নবী করীম (দঃ) তখন সে বৎসরই অর্থাৎ, নবুওয়তের দশম বৎসর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া তায়েফ গমন করিলেন এবং তায়েফবাসীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। দীর্ঘ ১ মাস কাল ক্রমাগত তাহাদের মাঝে তাবলীগ ও হিদায়তের কাজে নিয়োজিত রহিলেন কিন্তু একটি লোকের ভাগ্যেও সত্য গ্রহণের সৌভাগ্য হইল না; বরং যালেমরা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নানাভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্য শহরের কতিপয় বখাটে ও লম্পটকে লেলাইয়া দিল। এই নিষ্ঠুর বদনসীবরা সারওয়ারে কায়নাতে পিছনে লাগিয়া গেল। যদি রাহ্মাতুল-লিল-আলামীনের মহত্ত্ব প্রতিবন্ধক না হইত, তাহা হইলে তাঁহার পবিত্র ওষ্ঠের ঈষৎ কম্পনেই তাহাদের সমস্ত উন্মাদনা ও মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিয়া যাইতে পারিত এবং তায়েফ ও তায়েফবাসীর নাম-নিশানা পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ হইতে নিশিচহ্ন করিয়া দেওয়া হইত।

এই হতভাগ্য পাপিষ্ঠরা নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করিতে শুরু করিল যে, তাঁহার পবিত্র চরণ যুগল রক্তাক্ত হইয়া গেল। হযরত য়ায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) যেইদিক হইতে পাথর আসিতে দেখিতেন সেইদিকে ঝুকিয়া পড়িয়া ছয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করিতেন এবং পাথরের আঘাত নিজে মাথা পাতিয়া লইতেন। শেষ পর্যন্ত হযরত য়ায়েদের মাথা যখমে যখমে রক্তাক্ত হইয়া গেল। অবশেষে দীর্ঘ ১ মাস পর রহমতে আলম (দঃ) তায়েফ হইতে এমনই করুণ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিলেন যে, তাঁহার পবিত্র হাঁটু ছিল রক্তে রঞ্জিত। কিন্তু সেই মুহুর্তেও তাঁহার পবিত্র মুখে বদ-দো'আ বা অভিশাপের একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নাই।

নবী করীম (দঃ)-এর ইসরা ও মে'রাজ

নবুওয়তের একাদশ^১ বৎসরটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে যাহাতে ফখরুল-আম্বিয়া ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে টিকা

১০. মাওযাহিবে লাদুন্নিয়া গ্রন্থে ইমাম যুহরীর বর্ণনার বরাতে এমনি বলা হইয়াছে। — নাশরঃ ৩ ৩১৮

এই মর্মান্দাপূর্ণ শোভাযাত্রার মাধ্যমে সম্মানিত করা হয়। এই সম্মান সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র নবী করীম (দঃ)-এরই অনন্য বৈশিষ্ট্য। সংক্ষেপে এটি নিম্নরূপঃ

এক রজনীতে নবী করীম (দঃ) হাতীমে কা'বায়^১ শায়িত ছিলেন। এমন সময় জিব্রাঈল ও মিকাঈল (আঃ) আগমন করিয়া বলিলেন, “আমাদের সঙ্গে তোমার” তাঁহাকে বোরাক নামক বাহনের উপর আরোহণ করানো হইল। যাহার গতি দ্রুত ছিল যে, যে স্থানে তাহার দৃষ্টি পড়িত, সেখানেই গিয়া তাহার কদম পড়িত।^২ এমনি দ্রুত গতিতে নবী করীম (দঃ)-কে প্রথমে সিরিয়ায় আল-আকসা মসজিদে লইয়া যাওয়া হইল। এখানে আব্বাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সকল আশ্বিয়ায়ে নামকে (মো'জেয়া স্বরূপ) নবী করীম (দঃ)-কে স্বাগত জানাইবার জন্য সমবেত হওয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তথায় আযান উঠান এবং সকল নবী ও রাসূলগণ নামাযের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে ইমাম হইয়া নামায পড়াইবেন— সকলে ইহারই অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিকাঈল (আঃ) ছয়ুয়ে পাক (দঃ)-এর হাত ধরিয়া তাঁহাকে সকলের সামনে পড়াইয়া দিলেন। তিনি সমস্ত নবী রাসূল ও ফেরেশতাগণকে নামায পড়াইলেন।

এই পর্যন্ত ছিল পার্শ্ব জগতের সফর, যাহা বোরাকে আরোহণ করিয়া পাড়ি দিলেন। অতঃপর ক্রমানুযায়ী তাঁহাকে আসমানসমূহের সফর করানো হইল।^৩ প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। দ্বিতীয় আসমানে হযরত হাম (আঃ) ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-এর সহিত, তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সহিত, ৪র্থ আসমানে হযরত ইদ্রীস (আঃ)-এর সহিত, ৫ম আসমানে হযরত হারুন (আঃ)-এর সহিত, ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত এবং ৭ম আসমানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন।

—ফত্বুল বারী, ১৫ পারা, পৃষ্ঠা ৪৮৫

তাহার পর নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে পথারফ নিয়া যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে হাউয়ে কাওসার অতিক্রম করিলেন।

১।

এমনটি বোখারীর বর্ণনায় রহিয়াছে। বোখারীর কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) কা'বায় বাসভাবে শায়িত ছিলেন।

এতদসম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে যে, এই আসমানী সফর বোরাকের মাধ্যমে সংঘটিত হইল, না অন্য কোন সোপানের মাধ্যমে। হাফেয নাজমুদ্দীন গায়তী “কিসসাতুল-মো'রাজে” নামক বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। —পৃষ্ঠা ১২

অতঃপর তিনি বেহেশতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আল্লাহ তা'আলার সেইসব অপূর্ব সৃষ্টি ও বিস্ময়কর বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলেন, বাহা অদাবাধি কোন দৃষ্টি কোনদিন দর্শন করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের কল্পনাও সেখান পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। অতঃপর দোযথকে তাঁহার সামনে উপস্থাপন করা হইল। উহা ছিল সর্বপ্রকার শাস্তি ও এমন তীব্র লেলিহান আগুনে ভরপুর যাহার সম্মুখে সুকঠিন পাযাণেরও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

সেখানে তিনি একদল লোককে দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা মৃত জন্তু ভক্ষণ করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহারা কাহারো?” হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, “ইহারা হইতেছে সেইসব লোক যাহারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করিত (অর্থাৎ গীবত বা পরনিন্দা করিয়া বেড়াইত)।” অতঃপর দোযখের ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

তারপর নবী করীম (দঃ) সম্মুখপানে অগ্রসর হইলেন আর হযরত জিব্রাঈল আমীন (আঃ) সেখানেই রহিয়া গেলেন। কারণ এর বেশী অগ্রসর হওয়ার কোন অনুমতি তাঁহার ছিল না।

সেই সময় তিনি মহান আল্লাহ পাকের দর্শন লাভ করিলেন। বিশুদ্ধ মতে এই দীদার শুধু অস্তরের দ্বারাই নহে বরং চোখের দ্বারাও সম্পন্ন হইয়াছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিআল্লাহু আনহু এবং সমস্ত বিজ্ঞ সাহাবা ও ইমামগণের ইহাই অভিমত।

সেখানে নবী করীম (দঃ) সিদজায় পড়িয়া গেলেন এবং আল্লাহ তা'আলার সহিত তাঁহার কথাবার্তা বলার সৌভাগ্য হইল। তখনই নামাযসমূহ ফরয করা হয়।

ইহার পর নবী করীম (দঃ) প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেখান হইতে (পুনরায়) বোরাকে আরোহণ করিয়া মক্কা মুয়াযযামার দিকে চলিতে লাগিলেন।

পথে বিভিন্ন স্থানে কুরাইশদের তিনটি বাণিজ্যিক কাফেলার পাশ দিয়া অতিক্রম করিলেন। ইহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে তিনি সালামও করেন। তাহারা ছুয়ূর (দঃ)-এর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল এবং মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়া এ ব্যাপারে সাক্ষাৎ প্রদান করিল। ভোর হওয়ার পূর্বেই এই মোবারক সফর সমাপ্ত হইয়া যায়।

নবীর ইসরা সম্পর্কে চাক্ষুস সাক্ষ্য :

ভোরে কুরাইশদের মাঝে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িলে তাহাদের মধ্যে এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইল। কেহ হাততালি দিতে লাগিল আবার কেহ হতবাক হইয়া মাথায় হাত দিল, আবার কেহ বিদ্রুপের হাসি হাসিতে লাগিল। তারপর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সকলে নবী করীম (দঃ)-কে প্রশ্ন করিতে লাগিল, আচ্ছা বলুন দেখি,

হল মুকাদ্দাসের নির্মাণশৈলী কি ধরনের এবং ইহা পাহাড় হইতে কত দূরে
 নির্মািত? নবী করীম (দঃ) ইহার সম্পূর্ণ চিত্র বর্ণনা করিয়া দিলেন। এমনিভাবে
 তাহারা নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিল, আর হযর (দঃ) সেগুলির সঠিক উত্তর প্রদান
 করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহারা এমন সব প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল, যাহা
 তাহাদের দেখিয়া কাহারও পক্ষে বলা সম্ভব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মসজিদে আকসার
 নামক কতটি, তাক কয়টি ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলাবাহুল্য, এইসব কে গুনিয়া রাখে? কাজেই মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম কঠিন অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মো'জেযা স্বরূপ
 মসজিদে আকসাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দেওয়া হইল। তিনি গুনিয়া
 গুনিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিতে লাগিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)
 বলিয়া উঠিলেন— أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ অর্থাৎ, “আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি
 ঈশ্বরের সন্দেহে আল্লাহর রাসূল।” আর কোরাইশরাও সবাই স্তব্ধ হইয়া গেল এবং
 মনে লাগিল যে, (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে আকসার
 অবস্থা তো ঠিক ঠিকই বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবুবকর
 (রাঃ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, “আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, মুহাম্মদ
 (দঃ) এক রাত্রিতে মসজিদে আকসায় পৌঁছিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছেন?”
 হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উত্তরে বলিলেন, আমি তো ইহার চাইতেও অধিক
 বিস্ময়কর বিষয়েও তাহাকে বিশ্বাস করি। এবং আমি ঈমান পোষণ করি যে,
 যেখানে সকাল-সন্ধ্যায় চোখের পলকে তাহার কাছে আসমানী সংবাদসমূহ পৌঁছিয়া
 যায়, সেখানে মসজিদে আকসার ব্যাপারে দ্বিধা হইবে কেন?” এ কারণেও তাহার
 উপাধি “সিদ্দীক” দেওয়া হইয়াছে।

দয়ং কুরাইশ্-কাফিরদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য :

ইহার পর কুরাইশরা পুনরায় পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হযর (দঃ)-কে জিজ্ঞাসা
 করিল, “আচ্ছা বলুন তো, আমাদের অমুক কাফেলাটি যাহা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা
 করিয়াছে তাহা এখন কোথায়? হযর (দঃ) বলিলেন, “অমুক গোত্রের একটি
 বাণিজ্যিক কাফেলা রাওহা নামক স্থানে আমি অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের
 একটি উট হারাইয়া গিয়াছিল। ফলে তাহারা সকলে উহার খোঁজে বাহির হইয়াছিল।
 আমি তাহাদের হাওদার নিকটে গেলে সেখানে কেহই ছিল না। একটি সুরাহীতে
 পানি রাখা ছিল আমি তাহা পান করিয়াছিলাম।

ইহার পর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটি আমি অমুক স্থানে অতিক্রম
 করি। বোরাক যখন ইহার নিকটবর্তী হইল তখন উটগুলি ভয়ে এদিক-ওদিক

ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে একটি লাল রঙের উটের উপরে দুইটি সাদা ও কাল বর্ণের থলে ছিল। উহা তো অজ্ঞানই হইয়া পড়িয়া গেল।

তারপর অমুক গোত্রের বাণিজ্যিক কাফেলাটিকে আমি অতিক্রম করিয়াছি তানস্‌ম নামক স্থানে। এই কাফেলার সর্বাগ্রে খাকী রঙের একটি উট ছিল। উহার উপরে কাল চট এবং দুইটি কাল থলে ছিল। এই কাফেলা শীঘ্রই তোমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছবে।”

লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, “কবে নাগাদ?”

হযূর (দঃ) বলিলেন, “বুধবার নাগাদ আসিয়া যাইবে।”

সুতরাং হযূর (দঃ) যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক সেরূপই ঘটিল এবং এই কাফেলাগুলিও হযূর (দঃ)-এর বর্ণনার সত্যতা স্বীকার করিল।

যখন কুরাইশদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার দলীল-প্রমাণাদি সম্পূর্ণ হইয়া গেল এবং এই বিশ্বয়কর ভ্রমণ সম্পর্কে স্বয়ং তাহাদের জাতি-সম্প্রদায়ও সাক্ষ্য প্রদান করিল—তখন ঐ বিরুদ্ধবাদীদের জন্যও ইহাছাড়া অস্বীকারের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না যে, তাহারা হযূর (দঃ)-এর এই মোবারক সফরকে নিছক যাদু এবং তাঁহাকে যাদুকর (খোদা পানাহ) আখ্যা দিয়া মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

পবিত্র মদীনায়ে ইসলামঃ

একটানা দশ দশটি বৎসর যাবৎ নবী করীম (দঃ) আরবের বিভিন্ন গোত্রকে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের এমন কোন মাহফিল ও সভা-সম্মেলন তিনি ছাড়েন নাই যেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করেন নাই। হজ্জের মওসুমে, উকায়ের মেলায় এবং যিল-মাজায় প্রভৃতি স্থানে গিয়া তিনি মানুষকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানান। প্রত্যন্তরে তাহারা তাঁহাকে সর্বপ্রকার কষ্ট দিতে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতে রহিল। তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বলিত, “প্রথমে নিজের গোত্রকে মুসলমান বানান, তারপর আমাদিগকে হেদায়ত করিতে আসুন।” এমনিভাবে বেশ কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। অনন্তর যখন মহান আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করিলেন যে, ইসলামের প্রসার ও উন্নতি হউক, তখন মদীনার আউস গোত্রের কতিপয় লোককে নবী করীম ছালাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাদের মধ্যে আস'আদ ইবনে যুরার এবং যাক্‌ওয়ান ইবনে আবদে কায়েস—এই দুই ব্যক্তি সে বৎসর ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী বৎসর এই গোত্রেরই আরো কতিপয় লোক আগমন করিলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে ছয় অথবা আটজন মুসলমান হইলেন। নবী করীম (দঃ)

আমাদের বলিলেন, “তোমরা কি আল্লাহর সত্য-বাদীর প্রচারে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছ?” তাঁহারা নিবেদন করিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্তমানে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আউস ও খায়রাজ গোত্রের গৃহ-যুদ্ধ চলিতেছে। আপনি যদি এই সময় মদীনায় তশরীফ নিয়া যান তাহা হইলে আপনার হাতে আমাদের ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য হইবে না। আপনি আপাততঃ এক বৎসর জন্য এই ইচ্ছা স্থগিত রাখুন। সম্ভবতঃ আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধি হইয়া যাইবে। আমরা আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্রের লোকেরা একসাথে ইসলাম গ্রহণ করিব। আগামী বৎসর আমরা আবার আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব। তখন এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে।” অতঃপর তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া গেলেন। মদীনায় সর্বপ্রথম বনু-যুরায়কের মসজিদে কুরআন পাঠ করা হইল।

মদীনায় ইসলামের প্রসার ঘটুক—ইহাই ছিল আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা। সুতরাং এক বৎসরের মধ্যেই আউস ও খায়রাজের অধিকাংশ বগড়াই মিটমাট হইয়া গেল। আগামী হজ্জের মওসুমে যথা-প্রতিশ্রুতি ১২ ব্যক্তি নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপনীত হইলেন। ইহাদের ১০ জন ছিলেন খায়রাজ গোত্রের এবং ২ জন ছিলেন আউস গোত্রের। ইহাদের মধ্যে খাহারা গত বৎসর মুসলমান হন নাই তাঁহারাও এইবার মুসলমান হইয়া গেলেন এবং সবাই নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে বাইয়াত করিলেন। এই বাইয়াত হোহেতু সর্বপ্রথমে আকাবা নামক স্থানের নিকটে সম্পন্ন হইয়াছিল তাই ইহাকে ‘আকাবার প্রথম বাইয়াত’ (আনুগত্যের শপথ) নামে অভিহিত করা হয়।

—সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২

টিকা

১. তখন মদীনার অধিবাসীরা দুইভাগে বিভক্ত ছিল : (১) মুশরেকীন (২) আহলে কিতাব। মুশরেকীনরা দুইটি বিরাট গোত্রে বিভক্ত ছিল : (১) আউস ও (২) খায়রাজ। এই দুই গোত্রের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং প্রায় ১২০ বৎসর ধরিয়া তাহাদের পারস্পরিক যুদ্ধের চক্র চলিয়া আসিতেছিল। —সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

২. এমনিভাবে আহলে কিতাব তথা ইহুদীরাও দুই গোত্রে বিভক্ত ছিল : (১) বনু কোরায়যা ও (২) বনু-নায়ীর। এই দুই গোত্রও তাহাদের নিজেদের মধ্যে পুরাতন শত্রুতা পোষণ করিত।

—বায়যাতী

৩. অর্থাৎ, জুমরায়ে আকাবা যাহা মিনার প্রথম অংশে অবস্থিত। হাজীগণ ইহার উপর কংকর নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। পরে এইখানে একটি মসজিদও নির্মিত হইয়াছিল। ইহা মসজিদ-ই-বাইয়াত নামে পরিচিত ছিল। —সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২

ইহারা মুসলমান হইয়া মদীনায ফিরিয়া আসিলে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের চর্চা শুরু হইয়া গেল এবং প্রতিটি মজলিসে এই একটি কথারই আলোচনা হইতে লাগিল।

মদীনায ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা :

মদীনায পৌঁছিয়া আউস এবং খায়রাজ গোত্রের দায়িত্বশীল লোকেরা ছয়র (দঃ)-কে চিঠি লিখিলেন যে, এখানে আল্লাহর রহ্মতে ইসলামের প্রচার হইয়া গিয়াছে। এখন এমন একজন সাহাবীকে আমাদের এখানে পাঠাইতে মর্জি হয় যিনি আমাদের কুরআন শরীফ পড়াইবেন, লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিবেন, আমাদের শরীয়তের আহুকাম সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং আমাদের ইমামতী করিবেন। সূতরাং ছয়র (দঃ) হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাঃ)-কে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য মদীনায পাঠাইয়া দিলেন। এইভাবে ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসাটি পবিত্র মদীনা নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইল।

—সীরাতে হালবীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০৩

পরবর্তী বৎসর হজ্জের মওসুমে পবিত্র মদীনা হইতে এক দীর্ঘ কাফেলা মক্কা শরীফে আসিয়া পৌঁছিল। ইহাতে ৭০ জন পুরুষ আর ২ জন মহিলা ছিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে স্বাগত জানাইলেন এবং রাতে আকাবার সন্নিকটে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মধ্যরাতে সবাই জমায়েত হইলেন। নবী করীম (দঃ)-এর চাচা আব্বাসও তাঁহার সহিত আসিয়াছিলেন। (অবশ্য তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই।)

যখন সকলে সমবেত হইলেন, তখন হযরত আব্বাস (রাঃ) সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র (মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা তাঁহার গোত্রে সম্মান ও নিরাপত্তার সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন। আপনারা ধাঁহারা তাঁহাকে মদীনায লইয়া যাইতে চাহিতেছেন, তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনারা তাঁহার সহিত সম্পাদিত অঙ্গীকার যথাযথ পালন করিতে এবং শত্রুর হাত হইতে তাঁহার পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলেই কেবল এই দায়িত্ব গ্রহণে আগাইয়া আসুন অন্যথায় তাঁহাকে তাঁহার নিজের গোত্রেই থাকিতে দিন।”

উত্তরে মদনী কাফেলার সর্দার বলিয়া উঠিলেন, “নিঃসন্দেহে আমরা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি এবং নবী করীম (দঃ)-এর বাইয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়নই আমাদের একমাত্র কাম্য।” একথা শুনিয়া (অঙ্গীকার এবং বাইয়াতকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে) হযরত আস্আদ ইবনে যুরারা দাঁড়াইয়া বলিলেন, “হে মদীনাবাসীগণ! একটু

কর। তোমরা কি উপলব্ধি করিতে পারিবে? তোমরা আজ যে
 সম্পাদন করিতে যাইতেছ ইহা কিসের বাইয়াত? জানিয়া রাখ, এই বাইয়াত
 সমগ্র আরব ও আজমের বিরোধিতা আর মোকাবেলার অঙ্গীকার! যদি
 ইহা পূরণ করিতে পার, তবেই শুধু বাইয়াত সম্পাদন কর। অন্যথায়
 জানাইয়া দাও।” এই কথা শুনিয়া সকলেই এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,
 “আমরা কোন অবস্থাতেই এই বাইয়াত হইতে সরিয়া যাইব না।” অতঃপর তাঁহারা
 সিদ্ধান্ত করিলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করি, তাহা
 আমরা ইহার কি প্রতিদান লাভ করিব?” হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি
 ওয়াসাল্লাম বলিলেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জালাত।” একথা শুনিয়া সকলেই
 সন্তোষিত হইয়া উঠিলেন, “আমরা এতটুকুতেই সন্তুষ্ট। আপনি হস্ত প্রসারিত করুন। আমরা
 প্রসঙ্গ করি।” হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার হস্ত মোবারক বাড়াইয়া
 দিলেন এবং সকলে বাইয়াতের গৌরব অর্জন করিলেন।

সীরাতে পাকই জানেন—এই রাসূলে আম্মান (দঃ)-এর শুভ দৃষ্টি আর সামান্য
 কথোপকথান বাক্য তাহাদের অন্তরে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, মাত্র একটি
 মাস সাহচর্যের দৌলতেই সমস্ত পার্থিব পঙ্কিলতা আর সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি
 সন্তান-সম্পদের সমস্ত মোহ হইতে মুক্ত হইয়া তাহাদের অন্তর শুধুমাত্র এক
 সত্যের ভালবাসার রঙে রঙ্গীন হইয়া উঠিল। যাহার বিনিময়ে নিজেদের জান-মাল,
 মান-সম্মান সব কিছুই বিসর্জন দিতে তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া গেলেন। ইহার ছাপ
 তাহাদের পরবর্তী সন্তান-সন্ততি পর্যন্ত অব্যাহত রহিল। এই প্রসঙ্গে উক্ত বাইয়াতে
 সন্তুষ্টি হযরত উম্মে আম্মারার সাহেবযাদা হযরত হোবাইব-এর ঘটনা এখানে
 লিখা। নবুওয়তের ভণ্ড দাবীদার মুসাইলামাতুল কাযযাব তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিল
 এবং নানা প্রকার অকথা নির্যাতনের মধ্যে লিপ্ত রাখিয়া অভ্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা
 করিয়াছিল। কিন্তু এই অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির
 হইতে সক্ষম হয় নাই। পাপিষ্ঠ মুসায়লামা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি কি
 সাক্ষ্য প্রদান কর যে, মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রাসূল?” তিনি উত্তরে বলিতেন,
 “না পশাই।” তখন সে জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি এই সাক্ষ্যও প্রদান কর নাকি যে,
 আমি মুসায়লামাও আল্লাহর রাসূল?” তিনি উত্তরে বলিতেন, “কখনও না।” তখন
 সে তাহার একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিত। অতঃপর এমনিভাবে প্রশ্ন করিত আর তিনি
 তাহার নবুওয়তকে অস্বীকার করিতেন। তখন পাখণ্ডটি তাঁহার আরো একটি অঙ্গ
 কাটিয়া ফেলিত। এমনিভাবে এক একটি অঙ্গ করিয়া তাঁহার সমস্ত দেহ খণ্ড-বিখণ্ড
 করিয়া দিয়াছিল। —সীরাতে হালবীয়া, পৃষ্ঠা ৪০৯

বস্তুতঃ তিনি শহীদ হইয়া গেলেন, অথচ শরীয়তের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও ইসলামের অঙ্গীকারের বিপক্ষে একটি শব্দ উচ্চারণ করিতেও তিনি রাযী হইলেন না। কবি কি সুন্দরই না বলিয়াছেনঃ

اگر چه خرمن عمرم غم تو داد بباد ÷ بخاک پائے عزیزت که عهد نشکستم

“ভালবাসি শুধু এইটুকু জানি
মৃত্যু আমার পুরস্কার।
তব চরণের শপথ লাগে
ভুলে যাইনি অঙ্গীকার।”

অতঃপর সকলেই বাইয়াত করিলেন। এই বাইয়াতে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল ৭৩ (তিয়ান্ডর) জন পুরুষ আর ২ (দুই) জন মহিলা। ইহাকে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত বলা হয়।

অতঃপর নবী করীম (দঃ) হুঁহাদের মধা হইতে ১২ জনকে সমগ্র কাফেলার জিম্মাদার মনোনীত করিয়া দিলেন।

মদীনায় হিজরতের সূচনা

কুরাইশরা যখন এই বাইয়াতের সংবাদ অবগত হইল, তখন তাহাদের ক্রোধের অন্ত রহিল না। এবং তাহারা মুসলমানগণকে নির্যাতন করার কোন পন্থাই আর বাকী রাখিল না। তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরতের পরামর্শ দিলেন। সাহাবীগণ কুরাইশদের দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে গোপনে একজন দুইজন করিয়া মদীনার দিকে হিজরত করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় শুধু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং কিছু সংখ্যক অক্ষম লোক ছাড়া আর কোন মুসলমানই অবশিষ্ট রহিলেন না। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-ও হিজরতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন যে, “এখন থাকিয়া যাও, যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা আমাকেও হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন।” হযরত আবু বকর (রাঃ) এই অপেক্ষায়ই রহিলেন এবং হিজরতের উদ্দেশ্যে দুইটি উষ্ট্রী সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। একটি তাঁহার নিজের জন্য এবং অন্যটি হযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য।

—সীরাতে মোগলতাই, পৃষ্ঠা ৩১

৩) করীম (দঃ)-এর মদীনায় হিজরত :

কুরাইশের কাফেররা যখন সমুদয় পিয়য় জানিত্রে পারিল, তখন তাহারা ছয় মাসের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার উদ্দেশ্যে দারুন-নাদওয়াতে সমবেত হইল। কেহ কেহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখার পরামর্শ দিল। আবার কেহ কেহ তাকে নির্বাসিত করার পরামর্শ দিল। কিন্তু তাহাদের ধৃত লোকেরা বলিল, বন্দীদের কোনটিই করা উচিত হইবে না। কেননা বন্দী করা হইলে তাহার সমর্থকরা পানসারগণ আমাদের উপর চড়াও হইবে এবং তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে। তাহা হইলে তাহাকে নির্বাসিত করিলে তাহা হইবে আমাদের জন্য অধিকতর শান্তিকর। কারণ, এই অবস্থায় মক্কার আশ-পাশের সমস্ত আরবরা তাহার চরিত্র-বিস্ময়, মিষ্টকথা আর পবিত্র কালামের নিবেদিত প্রাণ হইয়া উঠিবে এবং তিনি তাহাদিগকে লইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করিয়া বসিবেন। —সীরাতে মোগলতাস্তে কাজেই হতভাগা আবু জাহ্ল প্রস্তাব করিল যে, মুহাম্মদ (দঃ)-কে হত্যা করা যাক। আর এই হত্যায় প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন করিয়া লোক অবশ্যই অংশগ্রহণ করুক যাহাতে বনু-আবদে মানাফ (নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওআলীয়াস্লামের গোত্র) প্রতিশোধ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। উপস্থিত সকলেই তাহার এই বক্তব্য পছন্দ করিল এবং প্রত্যেকটি গোত্র হইতে একজন করিয়া যুবককে এই কাজের জন্য নিযুক্ত করা হইল। তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, অমুক রাতে এই কাজ (সম্পন্ন) করিতে হইবে।

এইদিকে আল্লাহ্ রাক্বুল ইয়্যত নবী করীম (দঃ)-কে কুরাইশদের এই যড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করিয়া দিলেন এবং তাহাকে অবিলম্বে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিতে করিলেন। যে রাতে কুরাইশ কাফিররা তাহাদের হীন যড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করিল এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক হুজুর (দঃ)-এর বাসগৃহে প্রবেশ করিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই নবী করীম (দঃ) হিজরতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে বলিলেন, “তুমি আমার চাদর মোড়া দিয়া আমার তক্তপোষে শুইয়া থাক। তাহা হইলে কাফেররা আমার অনুপস্থিতি আঁচ হইতে পারিবে না।”

অতঃপর মহানবী (দঃ) যখন ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন তাহার দরজায় কুরাইশ কাফেরদের মেলা বসিয়া গিয়াছে। তিনি ‘সূরা ইয়াসীন’ তেলাওয়াত করিতে করিতে বাহির হইলেন এবং যখন فَاعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ—এই আয়াত

১১৩

আমরা তাহাদের চোখের উপরে পর্দা ফেলিয়া দিয়াছি। ফলে তাহারা দেখিতে পাইতেছে না।

পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন ইহাকে বেশ কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করিলেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের চোখের উপরে পর্দা ফেলিয়া দিলেন। তাহারা ছয় ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিতে পাইল না। তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে গিয়া উপনীত হইলেন। এদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন এবং পথ-ঘাট চিনে এমন একজন লোককে সঙ্গে নিয়া যাওয়ার জন্য তৈরী করিয়া রাখিয়াছিলেন।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গী হইলেন এবং উভয়ে বাড়ীর পিছনের খিড়কী পথে বাহির হইয়া সওর পর্বতের দিকে আগাইয়া গেলেন। (সওর হইল মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়)।

সওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থান :

নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরসহ সওর পাহাড়ের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন।

এইদিকে কুরাইশ যুবকরা ভোর অবধি ছয় ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসার অপেক্ষা করিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, তাঁহার বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) শুইয়া আছেন, তখন তাহারা হতভঙ্গ হইয়া গেল। কাল বিলম্ব না করিয়া তাহারা চতুর্দিকে নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোঁজে নিজেদের চর প্রেরণ করিল। কেহ কেহ তাঁহার পদ-চিহ্ন ধরিয়া খোঁজ করিতে করিতে ঠিক ঐ গুহার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সামান্য একটু নুইয়া তাকাইলেই নবী করীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিষ্কার দেখিতে পাইত। এই সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বিচলিত হইয়া উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, “ভয় করিও না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সাথে রহিয়াছেন।” পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলারই মহিমা যে, কাফেরদের দৃষ্টি ঐ গুহা হইতে অন্য দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল এবং কেহই এতটুকু ঝুঁকিয়া দেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল না; বরং তাহাদের সব চাইতে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনে খালাফ বলিয়া উঠিল, “এখানে তাঁহার থাকা অসম্ভব।” কারণ, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে এই গুহার প্রবেশ পথে রাতারাতি মাকড়শা জাল বুনিয়া রাখিয়াছিল এবং বন্য-কবুতর^১ কোথা হইতে আসিয়া বাসা তৈরী করিয়া ফেলিয়াছিল।

টিকা

১- হযরত সুহাইল (রাঃ) বলেন, হেরেম শরীফের কবুতরসমূহের বংশপরম্পরা সেই কবুতর হইতেই শুরু হয়। —সীরাতে মোগলতাঈ

আসলে খোদা (দঃ) আর সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এই গুহায় একটানা তিন রাত সুরাগোপন করিয়া রহিলেন। এমনকি আশ্রয়কারীরা নিরাশ হইয়া গেল।

এই তিন দিনই প্রত্যহ রাতের অন্ধকারে সিদ্দীকে আকবরের (রাঃ) পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ গোপনে তাঁহাদের কাছে আগমন করিতেন এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই নাকায় ফিরিয়া যাইতেন। সারা দিন কুরাইশদের সংবাদাদি সংগ্রহ করিয়া রাতে তাহা খোদা (দঃ)-এর সামনে বর্ণনা করিতেন। অপর দিকে তাঁহার বোন হযরত আস্মা (রাঃ) তে আবি বকর (রাঃ) প্রত্যহ রাতে তাঁহাদিগকে খাবার পৌঁছাইয়া দিতেন। তাহেতু আরবরা ছিল পদচিহ্ন বিশারদ, সুতরাং যাহাতে পদচিহ্নসমূহ মুছিয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ প্রত্যহ ঐ গুহা পর্যন্ত বকরীগুলিকে চরাইতে লইয়া হওয়ার জন্য তাঁহার গোলামকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন।

শওর গিরিগুহা হইতে মদীনা যাত্রা :

শওর পাহাড়ের গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪শা রবিউল আউয়াল^১ রোজ সোমবার হযরত সিদ্দীকে আকবরের আযাদকৃত গোলাম আমের ইবনে ফুহাইর সেই উষ্ট্রী দুইটি লইয়া উপস্থিত হইলেন, যেগুলি এই সফরের জন্যই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীতও আসিলেন, যাহাকে তিনি পথ-প্রদর্শক হিসাবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সঙ্গে নিয়াছিলেন।

নবী করীম (দঃ) একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করিলেন এবং হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) দ্বিতীয়টির উপর। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) খেদমতের জন্য আমের ইবনে ফুহাইরকেও নিজের সাথে বসাইয়া লইলেন। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উরাইকীত পথ-প্রদর্শনের জন্য আগে আগে চলিতেছিলেন। —সীরাতে হালবিয়া

সুরাকা ইবনে মালেকের অশ্ব

মুক্তিকা-গর্ভে খসিয়া যাওয়া :

হযর (দঃ) মদীনার পথে আগাইয়া চলিয়াছেন। এমন সময় কুরাইশী দূতগণের মধ্যে সুরাকা ইবনে মালেক হযর (দঃ)-কে তালাশ করিতে করিতে সেখান পর্যন্ত পৌঁছিয়া গেল। সে যখন হযর (দঃ)-এর নিকটবর্তী হইল, তখন তাহার ঘোড়াটি গুরুতরভাবে হেঁচট খাইলে সে ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া গেল। কিন্তু সে পুনরায় ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করিয়া হযর (দঃ)-এর পিছনে ধাওয়া করিল এবং এত

টিকা

১. যাহা নবী করীম (দঃ)-এর জন্ম-তারিখ হইতে ৫৩ (তিনগা) বৎসর এবং নবুওয়ত প্রাপ্তির সময় হইতে ১৩ (তের) বৎসর হয়।

নিকটে গিয়া পৌঁছিল যে ছয়র (দঃ)-এর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়ায পর্যন্ত সে শুনিতে পাইতেছিল। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বারবার পিছন ফিরিয়া তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। কিন্তু নবী করীম (দঃ) তাহার প্রতি নুক্ষেপও করিলেন না। যখন সে একেবারে কাছে আসিয়া গেল, তখন তাহার ঘোড়ার চারিটি পা-ই শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে হাঁটু পর্যন্ত ঢুকিয়া গেল এবং সুরাকা আবারও মাটিতে ছিটকইয়া পড়িল।

সে ঘোড়াটিকে বাহির করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল কিন্তু বার্থ হইল। অবশেষে বাধ্য হইয়া সে ছয়র (দঃ)-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিল। তিনি থামিয়া গেলেন এবং তাহার বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল।

—সীরাতে মোগলতাঈ

ঘোড়াটির পা যখন মাটির ভিতর হইতে বাহির হইল, তখন উহার পায়ের গহব্বর হইতে ধোঁয়া নির্গত হইতে দেখা গেল। ইহা দেখিয়া সুরাকা আরো বেশী হতভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে তাহার সমুদয় পাথ্যে সামগ্রী, উপস্থিত আসবাবপত্র, উট প্রভৃতি ছয়র (দঃ)-এর খেদমতে পেশ করিতে লাগিল। ছয়র (দঃ) তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, “যেহেতু তুমি ইসলাম গ্রহণ কর নাই, তাই আমি তোমার মাল গ্রহণ করিতে পারি না। তবে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি আমাদের অবস্থান কাহাকেও বলিবে না।” সুরাকা সেদিক হইতে ফিরিয়া আসিল এবং যে পর্যন্ত ছয়র (দঃ)-এর ক্ষতির আশঙ্কা ছিল সে কাহারও নিকট এই ঘটনা প্রকাশ করে নাই। —হাল্বীয়া ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩৬

সুরাকার মুখে নবী করীম (দঃ)-এর

নবুওয়তের স্বীকারোক্তি :

কিছুদিন পর সুরাকা আবু জাহলের নিকট উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিল এবং কয়েকটি পঙ্কক্তি^১ আবৃত্তি করিল যাহার অনুবাদ নিম্নরূপ :

টিকা

أَبَاحَكُمُ وَاللَّاتِ لُكُنْتُ شَاهِدًا ÷ لِأَمْرِجَوَابِ إِذْ تَسْوَعُ قَوَائِمَهُ
عَجِبْتُ وَلَمْ تَتَّكِدْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا ÷ نَبِيٌّ وَبِزُهَانٍ فَمُرْ ذَائِقَاوِمَهُ
عَلَيْكَ يَكْفَى النَّاسَ عَنْهُ فَأَنْتَنِي ÷ أَرَى أَمْرَهُ يَوْمًا سَتَبْدُو مَعَالِمَهُ
بِأَمْرِ يُؤَدُّ النَّاسَ فِيهِ بِأَسْرِهِمْ ÷ لَوْ بَانَ جَمِيعَ النَّاسِ طَرِيسَالِمَهُ

১০ আসল কবিতা এইগুলি নহে। এই কবিতাগুলি সীরাতে মোগলতাঈ গ্রন্থে ক্রটিযুক্ত ছিল। রাওয়াল্-উন্স গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা হইতে এইগুলিকে সংশোধন করা হইয়াছে।

“হে আবু হিকাম!> দেবতা লাভ-এর কসম খাইয়া বলিতেছি, তুমি যদি সেই ঘোড়াটির পা হাঁটু-পর্যন্ত যমীনে ঢুকিয়া পড়ার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে, তাহা হইলে মুহাম্মদ (দঃ)-যে আল্লাহর রাসূল, সে ব্যাপারে তোমার সন্দেহের কোন ধবকাশই থাকিত না। আমার মতে তাঁহার বিরোধিতা হইতে স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বিরত থাকা এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখা অবশ্যা কর্তব্য। কেননা, আমার দৃঢ়-বিশ্বাস, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার বিজয়ের নিদর্শনসমূহ ভাস্বর হইয়া উঠিবে আর তখন সকল মানুষই কামনা করিবে যে, যদি আমরা তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া লইতাম তাহা হইলে কতই না ভাল হইত।”

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেয়া,

স্বামীসহ উম্মে মা'বাদের ইসলাম গ্রহণঃ

মদীনার পথে নবী করীম (দঃ) উম্মে মা'বাদ বিনতে খালেদ নাম্নী জনৈকা মহিলার বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। তাহার যে বকরীগুলি আগে দুধ দিত না, ছয়র (দঃ) সেগুলির স্তনে হাত বুলাইয়া দিলে তাহা দুধে ভরিয়া উঠিল। ছয়র (দঃ) নিজেও তাহা পান করিলেন এবং তাঁহার সফর-সঙ্গীগণকেও পান করাইলেন। আর এই বরকত তেমনিভাবে অব্যাহত রহিল। ছয়র (দঃ) বিদায় নেওয়ার পর উম্মে মা'বাদের স্বামী বাড়ী ফিরিলেন এবং বকরীর দুগ্ধ সম্পর্কিত এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া হতবাক হইয়া গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উম্মে মা'বাদ বলিলেন, “একজন অত্যন্ত শরীফ ও মহান যুবক আজ আমাদের এখানে কিছু সময়ের জন্য অতিথি হইয়াছিলেন। এইসব তাঁহারই পবিত্র হাতের বরকত বটে।” তাহার স্বামী ইহা শুনিয়া বলিলেন, “আল্লাহর কসম! ইঁহাকে তো মক্কাবাসী সেই বুয়ুর্গ বলিয়াই মনে হইতেছে।” এক রেওয়াজতে আছে, ইহার পর এই বেদুইন-দম্পতিও হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

কুবায় অবতরণঃ

এখান হইতে রওয়ানা হইয়া তিনি কুবায় পৌঁছিলেন (ইহা মদীনার অদূরে একটি স্থান)। আনসারগণের নিকট যখন ছয়র (দঃ)-এর শুভাগমনের সংবাদ পৌঁছিল, তখন হইতে প্রতাহ তাঁহার সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে তাহারা মহল্লা হইতে বাহিরে

টিকা

১০ আবু জাহলের উপাধি সমগ্র আরবে ‘আবু-হেকাম’ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু কঠোর ইসলাম বিদ্বেষ্টী হওয়ার কারণে তাহাকে আবু জাহল উপাধি প্রদান করা হয়। এই ব্যাপারটি জনৈক ব্যক্তি কবিতার ভাষায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেনঃ

النَّاسُ كُنَّاهُ اِبَاحِكُمْ ۖ وَاللهُ كُنَّاهُ اَبَاجِهْلُ

চলিয়া আসিতেন। সেদিনও তাহারা যথারীতি অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তখন হঠাৎ এক আওয়ায শোনা গেল যে, এতদিন তাহারা যাহার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি তশরীফ আনয়ন করিয়াছেন। মহানবী (দঃ)-কে তশরীফ আনিতে দেখিয়া সকলেই বিপুল উদ্দীপনার সহিত সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। হযূর (দঃ) এবং তাঁহার সহচরগণ কুবায়ে ১৪ দিন^১ অবস্থান করিলেন। এই সময় তিনি কুবায়ে একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহাই সর্বপ্রথম মসজিদ, যাহা ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর নির্মিত হয়।

হযরত আলীর হিজরত এবং কুবায়ে মিলন :

যেহেতু নবী করীম (দঃ)-এর আমানতদারী কাফিরদের মাঝেও স্বীকৃত ছিল, কাজেই প্রায়শঃই তাঁহার নিকট লোকজনের আমানত গচ্ছিত থাকিত। হিজরতের সময় তিনি হযরত আলীকে সে কারণেই মক্কায় রাখিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট জনগণের গচ্ছিত আমানতসমূহ মানুষের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া তিনিও যেন তাঁহার পারে মদীনায়ে পৌঁছিয়া যান।

ইসলামী তারিখের সূচনা :

এই সময় নবী করীম (দঃ)-এর নির্দেশে হযরত ওমর (রাঃ)^২ ইসলামী দিন-পঞ্জিকার সূচনা করেন এবং “মুহাররম” মাসকে ইহার প্রথম মাস নির্ধারণ করেন।

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র মদীনায়ে প্রবেশ :

রবিউল আউয়াল মাসের জুম'আর দিন কুবা হইতে বিদায় নিয়া নবী করীম (দঃ) পবিত্র মদীনার দিকে রওযানা হইলেন। মদীনাবাসীগণ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া হযূর (দঃ)-এর সওয়ামী ঘিরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাহাদের কেহবা পদব্রজে আবার কেহবা কোন বাহনে আরোহণ করিয়া পথ চলিতেছিলেন। হযূর (দঃ)-এর উস্তীর লাগাম ধরিয়া টানিবার জন্য প্রত্যেকেই সন্মুখে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। হযূর (দঃ) যেন তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করেন—ইহাই ছিল প্রতিটি আনসারীর মনের বাসনা। মহিলা ও শিশুরা আনন্দের গান গাহিতেছিল। যেহেতু দিনটি ছিল জুম'আর দিন। তাই, বনী সালেম ইবনে আউফের বসতির নিকট জুম'আর নামাযের সময় হইয়া গেলে হযূর (দঃ) সওয়ামী হইতে অবতরণ

টিকা

১. কুবায়ে অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে আরো বিবিধ বর্ণনা রহিয়াছে। তিনদিন, চারদিন, পাঁচদিন এবং কোন কোন বর্ণনায় পাইশ দিনেরও উল্লেখ রহিয়াছে। —সীরাতে মোগলতাঈ পৃষ্ঠা ৩৬

২. শেখ জালালউদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) তাঁহার “التاريخ في علم التاريخ” গ্রন্থে ইহাকেই সম্বর্ধন করিয়াছেন।

নারিয়া জুম'আর নামায আদায় করিলেন এবং পুনরায় সওয়ার হইয়া সামনের দিকে প্রগ্রসর হইতে লাগিলেন। এখন যে আনসারীর বাড়ীই সামনে পড়িত তিনি তাহার বাড়ীতেই অবস্থান করিবার জন্য হুযূর (দঃ)-কে অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন। কিন্তু হুযূর (দঃ) বলিতেছিলেন, “তোমরা আমার উষ্ট্রীটিকে নিজের মনে চলিতে দাও, এটি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে আদিষ্ট রহিয়াছে। যে জায়গায় অবস্থানের জন্য ইহাকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে সেখানে পৌঁছিয়া সে নিজেই থামিয়া যাইবে। সুতরাং উটনীটি তেমনিভাবে আপন মনে চলিতে লাগিল। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর মাতুল বংশ বনী-আদী ইবনে নাজ্জারের এলাকায় হযরত আবু আইযুব আনসারী (রাঃ)-এর বাড়ীর সামনে গিয়া উটনীটি বসিয়া পড়িল। হুযূর ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইযুব আনসারীর মেহমান হইলেন এবং বেশ কিছু দিন তাঁহার গৃহেই অবস্থান করিলেন।

মসজিদে নববী নির্মাণ :

তখনও পর্যন্ত মদীনায় কোন মসজিদ ছিল না। যেখানেই সুযোগ হইত সেখানেই নামায আদায় করা হইত। ইহার পর ঐ জায়গাটি খরিদ করা হইল যেখানে উষ্ট্রীটি বসিয়াছিল। আর সে জায়গায়ই মসজিদে নববী নির্মাণ করা হইল।^১ ইহার দেওয়ালসমূহ ছিল কাঁচা ইটের তৈরী, খুঁটি ছিল খেজুর বৃক্ষের আর ছাদ ছিল খেজুর শাখা দ্বারা নির্মিত। তখন কেবলার রুখ ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে।

মসজিদের সঙ্গে দুইটি প্রকোষ্ঠও তৈরী করা হইল। একটি হযরত আয়েশার জন্য এবং অন্যটি হযরত সাওদার জন্য। ইহার পর নবী করীম (দঃ) তাঁহার পরিবার

টিকা

১- ইহার পর হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে আরো জায়গার সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু নির্মাণশৈলী আগের মতই বহাল রাখেন। ইহার পর হযরত উসমান (রাঃ) তাঁহার খিলাফতকালে ইহাতে বিরাট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। জায়গা অনেক বাড়িয়া দেন এবং দেওয়ালসমূহ নকশাযুক্ত পাথর ও রূপার কারুকার্য দ্বারা, থামসমূহ নকশাযুক্ত পাথর আর ছাদ শাল কাঠ দ্বারা তৈরী করেন। ইহার পর হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রাঃ) অলীদ ইবনে আব্দুল মালেকের খিলাফতকালে তদীয় নির্দেশে মসজিদের আরো পরিবর্ধন করেন এবং আযওয়াজে মুতাহহারাত্গণের (পবিত্র সহধর্মিনীদের) বাসস্থানসমূহকে ইহার মধ্যে शामिल করিয়া দেন। ইহার পর ১৬০ হিজরীতে খলীফা মাহ্দী এবং ২০২ হিজরীতে খলীফা মামুন ইহাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন এবং ইহার ভিত্তিকে অতিশয় মযবুত করিয়া দেন।

—সীরাতে মোগলত্বি পৃষ্ঠা ৩৭

ইহার পর উসমানী খলীফাগণ ইহা অতি সুন্দর ও মানোরম করিয়া নির্মাণ করেন—বাহা অদ্যাবধি বহাল রহিয়াছে।

পরিজনকে মদীনায় নিয়ে আসার জন্য একজন লোককে মক্কায় প্রেরণ করেন। ঐ সময় হযরত আবুবকর রাযিআল্লাহু আনহুও তাঁহার পরিবার পরিজনকে মদীনায় আনাইয়া নিলেন।

সূতরাং নবী-সহধর্মিণী হযরত সাওদা (রাঃ) এবং নবী-দুহিতা হযরত ফাতেমা ও উম্মে কুলসুম (রাঃ) মদীনায় আসিয়া গেলেন। তৃতীয় কন্যা হযরত যয়নাবাঈ তাঁহার স্বামী আবুল আস্ (যিনি তখনও মুসলমান হন নাই) আটকইয়া রাখিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ তাঁহার মাতা এবং উভয় বোন হযরত আয়েশা (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)-কে সঙ্গে লইয়া মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

এখন শারীরিকভাবে ভ্রমণ করিতে অক্ষম এইরূপ কতিপয় মুসলমানই শুধু মক্কায় অবশিষ্ট রহিয়া গেলেন। এমনকি এই অক্ষমদের মধ্য হইতেও কেহ কেহ মদীনায় উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁহাদের ওফাত হইয়া গিয়াছিল।

প্রথম হিজরী

[ইসলামে জিহাদের অনুমোদন ও নির্দেশ]

সারিয়াহ-এ-হামযা (রাঃ) ও সারিয়াহ-এ-উবায়দা (রাঃ) :

নবী করীম (দঃ)-এর ৫৩ বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবন-চিত্র পাঠকের সামনে আসিয়া গিয়াছে। এই পর্যায়ে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণসহ পৃথিবীতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার কেমন করিয়া হইয়াছে তাহাও মোটামুটি জানা গিয়াছে। হিজরতের পূর্বপর্যন্ত এই যে প্রতিটি শ্রেণী ও গোত্রের হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করিয়া এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহারা ইসলাম এবং ইসলামের নবীকে নিজেদের সহায়-সম্পত্তি, বাপ-দাদা, স্ত্রী-সন্তান অপেক্ষা বরং নিজেদের প্রাণের চাইতেও অধিক প্রিয় মনে করিতে লাগিয়াছিলেন, তাহাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণ কি ছিল? রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জোর জবরদস্তি, ধন-সম্পদের লোভ, সম্মান প্রতিপত্তির মোহ অথবা কোন সশস্ত্র বাহিনীর তরবারীর ভয় তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে বাধা করিয়াছিল, নাকি এর পশ্চাতে অন্য কোন কারণ ছিল?

কিন্তু যখন এই নিরক্ষর নবী (দঃ) [তাঁহার উপর আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ হউন]-এর পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবনের করুণ অবস্থাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন দ্বার্থহীনভাবেই এই সমস্তের নেতিবাচক উত্তর পাওয়া যায়। আর ইহা অত্যন্ত প্রকাশ্য সত্য যে, সেই এতীম সন্তানটি যাহার পিতার স্নেহচ্ছায়া পৃথিবীতে

মাগননের পূর্বেই তাঁহার মাথার উপর হইতে উঠিয়া গিয়াছিল, যাহাকে শৈশবের ৬য় বৎসর বয়সে জননীরা স্নেহ-মমতার কোড় হইতেও বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, যাহার পক্ষে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বালাইবার সুযোগ পর্যন্ত আসিত না, যাহার পরিবার-পরিজন কোনদিন পেট ভরিয়া খাইতে পর্যন্ত পাইত না, যাহার হাতেগনা আঁবিত আত্মীয়-স্বজনও একটি মাত্র সত্যের বাণী উচ্চারণ করার অপরাধে শুধু যে গ্রহের নিকট হইতে দূরেই সরিয়া গিয়াছিল তাহাই নহে, বরং তাঁহার কঠিন শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল, তিনি কি কাহারও উপর রাজত্ব কায়ম করার লোভ করিতে পারেন অথবা ধন-সম্পদের লোভ দেখাইয়া বা তরবারীর জোরে কাহাকেও স্বীয় মতাদর্শে উদ্ভুদ্ধ করিতে পারেন? এতদ্ব্যতীত ইতিহাসের বিরাট দফতর আমাদের সামনে পড়িয়া রহিয়াছে যাহাতে সর্বসম্মতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে যে, নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবনের এই ৫০টি বৎসর এমনভাবে অভিবাহিত হইয়াছে যে, প্রথম জীবনের সহায় সম্বলহীনতা ও অসহায়ত্বের পারে যখন ইসলাম অনেকটা প্রকাশ্য-শক্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল এবং অনেক বড় বড় বীর যোদ্ধা ও বিত্তশালী সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখনও ইসলাম কোন কাফেরের গায়ে প্রত উঠায় নাই বরং অত্যাচারীদের অত্যাচারেরও কোন জবাব পর্যন্ত দেয় নাই।

অথচ মক্কার কাফেরদের পক্ষ হইতে শুধু নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নহেন; বরং তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ও অনুসারী-অনুরাগীগণের উপর এমন অকথা নির্যাতন চালানো হইয়াছে যাহা বলিয়া অথবা লিখিয়া প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কুরাইশ কাফেররা হুযর (দঃ)-এর প্রতি নির্যাতনে, এমনকি তাঁহাকে হত্যা করার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন চেষ্টা বাকী রাখে নাই। যেমনঃ দীর্ঘ তিন তিনটি বৎসর নবী করীম (দঃ)-কে তাঁহার সকল অনুসারী ও অনুরাগীগণসহ অবরুদ্ধ করিয়া রাখা, নবী করীম (দঃ)-এর সহিত কুরাইশদের পূর্ণাঙ্গ সংস্পর্কচ্ছেদ, তাঁহাকে হত্যা করার যড়যন্ত্র ও সাহাবা কেবালের প্রতি বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন ইত্যাদি যাহা আপনারা অবগত হইয়াছেন।

এই সমস্ত কিছু সত্ত্বেও কোরআন তাহার অনুসরণকারীগণকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা প্রবলম্বন ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র ব্যবহারেরই অনুমতি দিতেছিল না। অবশ্য তখনও যেরূপ জেহাদের নির্দেশ ছিল, তাহা হইলঃ কাফেরদেরকে কৌশল^১ ও উপদেশমূলক

টিকা

১. পবিত্র কুরআনের আয়াত

أذْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَاتِي هِيَ أَحْسَنُ

কথাবার্তার মাধ্যমে স্বীয় প্রভুর দিকে আহ্বান করো, আর যদি পারম্পরিক বিতর্কের উদ্ভব হয়, তাহা হইলে উত্তম কৌশল এবং নম্র কথার মাধ্যমে তাহাদের মোকাবিলা করো এবং কোরআনের প্রকাশ্য দলীল^১ প্রমাণাদির মাধ্যমেই তাহাদের সহিত পূর্ণ জেহাদ করো যেন তাহারা সতাকে অনুধাবন করিতে সক্ষম হয়।

এই সময় পর্যন্ত যে হাজার হাজার মানুষ ইসলামের বলয়ভুক্ত হইয়া সর্ব-প্রকার নির্যাতনের শিকারে পরিণত হইতে সম্মত হইয়াছিলেন, বলাই বাহুল্যঃ তাহারা দুনিয়ার কোন লোভ-লালসা অথবা রাষ্ট্রীয় শক্তিপ্রয়োগ কিংবা তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য হইতে পারেন না। এই প্রকাশ্য বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করার পরেও কি তাহারা আল্লাহ তা'আলার নিকট লজ্জিত হইবে না, যাহারা ইসলামের প্রকৃত বাস্তবতার উপর পর্দা নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে বলিয়া বেড়ায় যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে? তাহারা কি এই প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারিবে যে, ঐ সমস্ত তরবারী চালনাকারীর উপরে কে তরবারী চালনা করিয়াছিল—যাহারা শুধু মুসলমানই হন নাই; বরং ইসলামের প্রয়োজনে তরবারী ধারণ করিতে এবং নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করিতে কৃষ্টাবোধ করিতেন না? তাহারা কি বলিতে পারে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ), ফারাকে আযম (রাঃ), উসমান গণী (রাঃ) আর আলী মূর্তাযা (রাঃ)-এর উপরে কে তরবারী চালাইয়া তাঁহাদিগকে মুসলমান বানাইয়াছিল? হযরত আবুবর গিফারী (রাঃ), হযরত উনায়স (রাঃ) এবং তাঁহার গোত্রকে কে বাধ্য করিয়াছিল যে, তাহারা সবাই আসিয়া ইসলামে প্রবেশ করিয়াছিলেন? নাজরানের খৃষ্টানগণের উপর কে বলপ্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহারা মক্কায় আসিয়া স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গেলেন? যামাদ আযদীকে কে বাধ্য করিয়াছিল? তোফায়ল ইবনে আমর দূসী (রাঃ) এবং তাঁহার গোত্রের লোকদের উপর কে তরবারী চালনা করিয়াছিল? বনী আব্দুল আশ্হাল গোত্রের উপরে কে চাপসৃষ্টি করিয়াছিল? মদীনার সমস্ত আনসারের উপর কে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাঁহারা শুধু ইসলাম গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; বরং নবী করীম (দঃ)-কে নিজেদের দেশে ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত যিন্মাদারী স্বীয় মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং নিজেদের জান-মাল তাঁহার জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন? বুয়ায়দা আসলামীকে কে বাধ্য করিয়াছিল যে, তিনি ৭০ জন লোকের বিরট কাফেলাসহ মদীনার পাথে হযর (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছায় ও স্বেচ্ছাসাহে মুসলমান হইয়া গেলেন? হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর উপর কোন

টিকা

১০ কোরআনের আয়াত وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا এর মর্মার্থও ঠিক ইহাই।

৩১৫১ চালাত হইয়াছিল যে, তিনি তাহার বাদশাহী ও দোদগু প্রতিপত্তি সঙ্কেত
 তিজরতের পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন? আনু হিন্দ, তামীম, নাসিম প্রমুখের
 উপর কে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল যে, তাহার সুদূর সিরিয়া হইতে সফর করিয়া
 নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপনীত হইলেন এবং তাহার গোলামী বরণ করিয়া
 গইলেন? এমনি ধরনের শত শত ঘটনায়^১ ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ হইয়া আছে।
 এগুলি এমন অনস্বীকার্য বাস্তব যাহা প্রত্যক্ষ করার পর প্রত্যেকটি মানুষ এই বিশ্বাস
 পোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না যে, “ইসলাম স্বীয় মহিমা প্রচারে কদাচ
 ৩১৫১র মুখাপেক্ষী^২ ছিল না।”

ইসলাম স্বীয় প্রচারে

৩১৫১র মুখাপেক্ষী নহে :

জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য কল্পনাকালেও এই হইতে পারে না যে, মানুষের
 গলায় ৩১৫১ রাখিয়া তাহাদিগকে মুসলমান হইতে বাধ্য করা হইবে অথবা
 তাহাদিগকে কোন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ করানো হইবে। জিহাদের
 সাথে সাথে জিয়্যা^৩ করের নির্দেশ এবং কাফেরদিগকে যিস্মী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত
 করিয়া ঠিক মুসলমানদের মতই তাহাদের জান মালের হেফযত সংক্রান্ত ইসলামী
 বিধানসমূহ নিজেই ইহার সাক্ষ্য বহন করে যে, জিহাদ ফরয হওয়ার পরও ইসলাম
 কখনও কোন কাফেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করে নাই। তাই যে কোন
 ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য হইল তিনি যেন শাস্ত মনে চিন্তা করেন যে, ইসলামে
 কি উদ্দেশ্যে এবং কি কি উপকারিতার জন্য জিহাদ ফরয করা হইয়াছে। তাহা
 হইলে তিনি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবেন যে, যেমন সেই ধর্মতকে পূর্ণাঙ্গ মনে
 করা যায় না, যেটি মানুষের গলায় ফাঁস লাগাইয়া বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহার
 ধনসারী বানাইয়াছে তেমনভাবে সেই ধর্মও পরিপূর্ণ নহে, যাহাতে রাজনীতির স্থান
 নাই এবং সেই রাজনীতিও পূর্ণাঙ্গ নহে যাহার সহিত ৩১৫১র সম্পর্ক নাই।

টিকা

১. এই সমস্ত ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে “রিসালায়ে হামীদিয়া” পুস্তক হইতে গৃহীত হইয়াছে।
২. পাঠক যদি বাস্তবতার নিরীখে বিশুদ্ধ ও নির্ভুলভাবে পৃথিবীর বুকে ইসলাম কেমন করিয়া
 পরিচালিত ও প্রসারিত হইয়াছে—তাহা জানিতে চাহেন তাহা হইলে মেহেরবানী করিয়া দারুল
 উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান রচিত “এশায়াতে ইসলাম” নামক
 পুস্তকখানা অধ্যয়ন করিবেন।

৩. সেই কর যাহা কাফেরদের নিকট হইতে তাহাদের নিরাপত্তার বিনিময়ে গ্রহণ করা
 হয়।
৪. তাহাকে জিয়্যা বা সামরিক কর বলা হয়।

রাজনীতিবিবর্জিত ধর্ম ও অস্ত্রবিবর্জিত রাজনীতি

পূর্ণাঙ্গ নহে :

সেই চিকিৎসক নিজের পেশায় কখনও দক্ষ হইতে পারে না, যে শুধু মলম লাগাইতেই কিংবা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে জানে, কিন্তু গলিত ও অকোজে অঙ্গসমূহের অস্ত্রোপচার করিতে জানে না।

کوئی عرب کے ساتھ ہو یا ہو عجم کے ساتھ

کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ

“আরব বা অনারব যে জোটেই থাক

তরবারী কলমের সাথে সাথে রাখ।”

খুব ভাল করিয়া অনুধাবনের চেষ্টা কর যে, যখন পৃথিবীর সারাটা দেহ জুড়িয়া শিরকের বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ছড়াইয়া পড়িল এবং সেটি একটি ব্যাধিগ্রস্ত দেহের মত হইয়া পড়িল, তখন পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা ইহাকে ব্যাধি-মুক্ত করিবার লক্ষ্যে একজন সংস্কারক এবং দরদী চিকিৎসক [মুহাম্মদ (দঃ)]-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহার জীবনের ৫৩টি বৎসর বিরামহীনভাবে ইহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও প্রতিটি শিরা-উপশিরা নিরাময় করিয়া তোলার জন্য চিন্তা ভাবনা ও চেষ্টা সাধনা করিলেন। ফলে, সংশোধনযোগ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ সুস্থ হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কোন অঙ্গ যেগুলি সম্পূর্ণভাবে পচিয়া গিয়াছিল এবং সেগুলির সংশোধনের কোন উপায়ই অবশিষ্ট রহিল না বরং প্রতি মুহূর্তে ইহাদের বিযক্রিয়া সমগ্র দেহে সংক্রমিত হইয়া পড়ার আশঙ্কা দেখা দিল, তখন অপারেশানের মাধ্যমে ঐ ব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গসমূহকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়াই ছিল করুণা ও প্রজ্ঞার তাগিদ। ইহাই জেহাদের তাৎপর্য এবং ইহাই ছিল সকল আক্রমণাত্মক আর প্রতিরোধমূলক অভিযানের উদ্দেশ্য।

এই কারণেই সমরক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলাকালেও ইসলাম তাহার প্রতিপক্ষের শুধু সেই সমস্ত লোককে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করিয়াছে যাহাদের ব্যাধি ছিল সংক্রামক। অর্থাৎ, যাহারা স্বভাবগতভাবে অনাকেও ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিতেছিল অর্থাৎ, যাহারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার পরিকল্পনা করিত এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। কিন্তু তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত নারী, শিশু এবং সেই সকল বৃদ্ধ ও ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ—যাহারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিত না—তাহারা তখনও মুসলমানদের তরবারী হইতে নিরাপদ ছিল। এমনকি যে সকল লোক কোন চাপের মুখে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিত তাহারাও মুসলমানদের হাত হইতে নিরাপদ ছিল। হযরত ইক্রামা (রাঃ) বলেন, “বদরের যুদ্ধে নবী করীম (দঃ)

নির্দেশ দিয়াছিলেন, যদি বনু-হাশেম গোত্রের কোন লোক তোমাদের সম্মুখে আগমন করে, তবে তাহাকে হত্যা করিও না। কারণ, সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই; বরং তাহাকে জোর করিয়া আনা হইয়াছে।

—কান্যুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

বস্তুতঃ রনাসনে উপস্থিত ও সরাসরি যুদ্ধে লিপ্তদের মধ্য হইতেও যথাসম্ভব সেই সকল লোককে রক্ষা করা হইত যাহাদের সংস্কার ও উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) অবহিত হইতেন। নিম্নের ঘটনাটি আমাদের এই দাবীর স্বপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বহন করে :

৮ম হিজরী সালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে মক্কার পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পথে জনৈক বেদুইন সর্দার তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং সে ছয় ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জেহাদকেও জাহেলীয়াত যুগে আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের সহিত তুলনা করিয়া নিবেদন করিল যে, আপনি যদি সুন্দরী নারী আর লাল রঙ্গের উট পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে বনু-মুদাল্লাজ গোত্রের উপর আক্রমণ করুন। (কেননা, তাহাদের মধ্যে এই দুইটি প্রচুর পরিমাণে মওজুদ আছে)। কিন্তু এখানে যুদ্ধ আর সন্ধির উদ্দেশ্যই ছিল অন্য রকম। কাজেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ পাক আমাকে বনী মুদাল্লাজ গোত্রকে আক্রমণ করিতে একারণে নিষেধ করিয়াছেন যে, তাহারা পরস্পর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

—এহুইয়াউল-উলুম

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, “একদা নবী করীমের (দঃ) নিকট সাতজন যুদ্ধবন্দীকে উপস্থিত করা হইলে ছয় (দঃ) ইহাদিগকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন। ঠিক এমনি সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করিলেন এবং ছয় (দঃ)-কে বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ছয় জনের ব্যাপারে এই নির্দেশই বহাল রাখুন, কিন্তু এ একটি লোককে মুক্ত করিয়া দিন। ছয় (দঃ) ইহার কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, সে উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দানশীল। নবী করীম (দঃ) বলিলেন, আপনি কি নিজের পক্ষ হইতে এই সুফারিশ করিতেছেন, না ইহা আল্লাহ তা'আলারই আদেশ? জিব্রাঈল (আঃ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলাই আমাকে ইহার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।”

—কান্যুল উম্মাল, পৃষ্ঠা ১৩৫; ইবনুলজাওয়ী

ইসলামী জিহাদ তথাকথিত সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয় জাতিসমূহের পৃথিবী-বিক্ষণসী যুদ্ধ ছিল না যাহাতে নিজেদের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার জন্য

নারী-পুরুষ, দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে শহরকে শহর অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। মরহুম আকবর এলাহাবাদী কি সুন্দর বলিয়াছেন :

هو رہا ہے نفاذ حکم فنا نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکان
توپیں خود آکے اب تو میدان میں پڑھتی ہیں کُلُّ مَن عَلَيَّهَا فَانْ

“বিনাশের বাণী সশব্দে নিনাদিত

মানুষ পুড়িছে যথা, তথা তার ঘর।

বারুদ সদর্পে মাঠে করে পাঠ,

‘সব কিছু জ্বলে পুড়ে যাবে এর পর’।”

কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, মানুষ অন্যের চোখে সামান্য খড় পড়িলেও তাহা দেখিতে পায় কিন্তু নিজের চোখের কড়িকাঠকেও উপেক্ষা করে।^১ কবি আকবর এলাহাবাদী ঠিকই বলিয়াছেন :

اپنے عیبوں کی نہ کچھ پروا ہے غلط الزام بس اور وہ لگا رکھا ہے
یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

“আপনার দোষ ফিরিয়া না দেখে

পরোয়া করে না লোক-লজ্জায়।

অন্যের করে মিছা বদনাম

অপবাদ হানে অবলীলায়।

মিছামিছি কয় অস্ত্রের বলে

ছড়ালো ইসলাম সব জা'গায়।

এত কিছু কয় তবু না কহিল

তোপের আশীষে কি কি ছড়ায়।”

টিকা

১. যদি ইউরোপের রক্তাক্ত ইতিহাসের সেই অধ্যায়সমূহকে সামনে রাখা হয়, যাহা স্পেনের উত্থান ও পতনের সহিত সম্পৃক্ত, তাহা হইলে তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখোমুখি পুলিয়া যাইবে। কেননা, স্বয়ং ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা ও স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সেখানে দেখা যায়, নবম শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত গোলাগুলি, হত্যা, অপহরণ প্রভৃতি বিভিন্ন জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে মুসলমানদিগকে বৃষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দাকে জ্বলাইয়া পোড়াইয়া ভগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হইয়াছে, শত শত লোককে গ্রেকতার করিয়া তাহাদের চোখের সামনে তাহাদের সন্তান-গণকে যবেহ করা হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান স্বীয় ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত হিজরত করিতে বাধ্য +

সারকথা, আত্মরক্ষামূলক আর আক্রমণাত্মক উভয় প্রকার জিহাদেরই উদ্দেশ্য ছিল শুধু উত্তম চরিত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটানো, ইসলামের নিরাপত্তা বিধান আর ইসলাম প্রচারের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয় সেগুলির অপসারণ।

এই সমস্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করার পর যেমনিভাবে সাধারণ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ এবং মার্গোলিউস ও অন্যান্যের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় যে, ইসলামী জেহাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো এবং লুটতরাজের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করা, তেমনিভাবে ইসলামী ঐতিহ্য এবং সাহাবীগণের দীর্ঘদিনের আচার-অভ্যাস ও কর্মসমূহ একত্রিত করার পর এ ব্যাপারেও আর কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকে না যে, ইসলামে যেমন নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে আত্মরক্ষামূলক জেহাদ ফরয করা হইয়াছে, তেমনিভাবে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও ইসলাম প্রচারের প্রতিবন্ধকতাসমূহকে অপসারিত করার জন্য আক্রমণাত্মক জেহাদও কিয়ামত পর্যন্ত ফরযী করা হইয়াছে।^১ এবং আত্মরক্ষামূলক জেহাদের উদ্দেশ্যে যেমন মানুষকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো নহে, তেমনিভাবে আক্রমণাত্মক জেহাদের উদ্দেশ্যেও কয়দিন-কালে তাহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে সাক্ষাত সমরক্ষেত্রেও ইসলামের প্রশস্ত আঁচল কাফেরগণকে নিজের আশ্রয়ে স্থান দিতে এবং কুফুরীর উপর বহাল থাকা সত্ত্বেও তাহাদের জান-মাল এবং মানসভ্রমকে তেমনিভাবে রক্ষা করার জন্য প্রসারিত রহিয়াছে, যেমনিভাবে একজন মুসলমানকে রক্ষা করা হইয়া

টিকা

- হইয়াছেন। গ্রানাডার ময়দানে মুসলমানদের লিখিত অতিশয় মূল্যবান ও দুস্ত্রাপা ৮০ হাজার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির এক বিপুল ভাণ্ডারকে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা ফিলীপ দ্বিতীয় শাসন এলাকায় আরবী ভাষার একটা বাক্য উচ্চারণ করাও অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। মুসলমানদের স্মৃতিচিহ্নসমূহকে একে একে মিটাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কর্ডোভার অদ্বিতীয় জামে মসজিদে একাধিক গীর্জা তৈরী করা হইয়াছে। এখানকার হামরা ও যোহরা প্রাসাদ যাহা সারা জাহানের মধ্যে অদ্বিতীয় ইমারত ছিল এবং যাহা ১২ হাজার গাভুজবিশিষ্ট আর لا اله الا الله এর আওয়াজে সরব ও সরগরম ছিল—উহার মধ্যে ত্রিকোণবিশিষ্ট স্তম্ভ ও গীর্জা তৈরী করা হইয়াছে যাহা আজও বিদ্যমান।

(এই সমস্ত বর্ণনা আল্লামা মোহাম্মদ করদে আলী রচিত "غابرة الناس وحاضرهما" গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে তিনি স্পেনের অতীত ও বর্তমানকালের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন।)

১০ নবী করীম (দঃ)-এর বাণী—*أَلْجِهَادُ ماضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ* এর মর্মার্থও ইহাই।

থাকে—উহাতে আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক উভয় জেহাদই সমান। ইহাছাড়াও পৃথিবীতে সত্যিকার শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করা, দুর্বলদেরকে অত্যাচারীদের কবল হইতে মুক্ত করা ইত্যাদি যাহা জেহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—উহাতেও উভয় প্রকার জেহাদেরই ভূমিকা সমান। সুতরাং ইহার কোন কারণ নাই যে, ইসলামী ঐতিহ্যের বিকৃতি ঘটাইয়া আক্রমণাত্মক জেহাদকে অস্বীকার করিতে হইবে—যেমন আমাদের কোন কোন মুক্ত-বুদ্ধি ও স্বাধীনচিন্তাবিদ ঐতিহাসিক করিয়া থাকেন।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আমাদের আসল উদ্দেশ্যের অব-
তারণা করিতেছি :

হিজরতের পর যখন ইসলাম মদীনায় এক প্রকার রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিল, তখন নবী করীম (দঃ)-কে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হইল এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হইতে লাগিল। এই যুদ্ধাভিযান-সমূহের কোন কোনটিতে নবী করীম (দঃ) স্বয়ং সশরীরে অংশগ্রহণ করেন, আর কোন কোনটিতে বিশেষ বিশেষ সাহাবীর নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন। ঐতিহাসিক-গণের পরিভাষায় প্রথম প্রকার যুদ্ধকে “গায়ওয়াহ্” এবং দ্বিতীয় প্রকার যুদ্ধকে “সারিয়াহ্” বলা হয়। গায়ওয়াহ্ সংখ্যা ২৩টি। তন্মধ্যে মাত্র ৯টিতে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। অনাগুলিতে আদৌ কোন যুদ্ধই হয় নাই। সারিয়াহ্ সংখ্যা ৪৩টি। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এই সকল গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্ মধ্যে মুসল-মানদের যুদ্ধাত্মের অপ্রতুলতা এবং সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও বিজয় তাহাদের পক্ষেই থাকে। অবশ্য শুধু উহুদ যুদ্ধে প্রথমে বিজয় লাভের পর মুসলমানদের পরাজয় হয়, তাহাও শুধু এইজন্য যে, সৈন্যদের একটি অংশ নবী করীম (দঃ)-এর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল।

আমরা এই সমস্ত গায়ওয়াহ্ ও সারিয়াহ্কে অধিকতর সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বর্ষওয়ারী ছক আকারে নিম্নে পেশ করিতেছি। যেহেতু গায়ওয়াহ্ ও সারিয়াহ্-সমূহের তারিখ ও সংখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে, কাজেই সেসব মতভেদ পরিহার করিয়া সমস্ত বর্ণনায় হাফিজে হাদীস আল্লামা মোগলতাই রচিত সীরাতের উপর নির্ভর করিয়াছি।

নকশা নিম্নরূপ :

সন

গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্

১ম হিজরী ২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্ -এ-হামযা (রাঃ), (২) সারিয়াহ্ -এ-উবায়দা (রাঃ)।

দন

গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্

২য় হিজরী

৫টি গায়ওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা : (১) গায়ওয়াহ্-এ-আবওয়া, ইহাকে গায়ওয়াহ্-এ-ওয়াদ্দানও বলা হয়। (২) গায়ওয়াহ্-এ-বাওয়াত, (৩) গায়ওয়াহ্-এ-বদরে কুবরা, (৪) গায়ওয়াহ্-এ-বনী কায়নুকা, (৫) গায়ওয়াহ্-এ-সাভীক।

এবং তিনটি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ, (২) সারিয়াহ্-এ-উমাইর, (৩) সারিয়াহ্-এ-সালেম।

এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে বদর যুদ্ধই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

৩য় হিজরী

৩টি গায়ওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা :

(১) গায়ওয়াহ্-এ-গাতফান, (২) গায়ওয়াহ্-এ-উল্হদ, (৩) গায়ওয়াহ্-এ-হামরাউল আসাদ।

এবং ২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা, (২) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা।

এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে উল্হদ যুদ্ধই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

৪র্থ হিজরী

২টি মাত্র গায়ওয়াহ্ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। যথা :

(১) গায়ওয়াহ্-এ-বনী নাযীর, (২) গায়ওয়াহ্-এ-বদরে সুগ্গরা।

এবং ৪টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্-এ-আবু সালামা, (২) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে উনায়স, (৩) সারিয়াহ্-এ-মুনযির, (৪) সারিয়াহ্-এ-মারসাদ।

৫ম হিজরী

৪টি গায়ওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা :

(১) গায়ওয়াহ্-এ-যাতুর-রেকা, (২) গায়ওয়াহ্-এ-দু-মাতুল-জান্দাল, (৩) গায়ওয়াহ্-এ-মুরাইসী। ইহার আরেক নাম গায়ওয়াহ্-এ-বনীল মুস্তালেক, (৪) গায়ওয়াহ্-এ-খন্দক।

ইহাদের মধ্যে খন্দক যুদ্ধই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

৬ষ্ঠ হিজরী

৩টি গায়ওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা :

(১) গায়ওয়াহ্-এ-বনী-লাহ্ইয়ান, (২) গায়ওয়াহ্-এ-গাবাহ। ইহার আরেক নাম গায়ওয়াহ্-এ-যী-কারাদ, (৩) গায়ওয়াহ্-এ-হোদায়বিয়া।

এবং ১১টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

সন

গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্

৬ষ্ঠ হিজরী

(১) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমা—কারতা অভিমুখে, (২) সারিয়াহ্-এ-আক্কাশা, (৩) সারিয়াহ্-এ-মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা—যিলকুস্‌সা অভিমুখে, (৪) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা—বনী-সুলাইম অভিমুখে, (৫) সারিয়াহ্-এ-আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, (৬) সারিয়াহ্-এ-আলী, (৭) সারিয়াহ্-এ-যায়েদ ইবনে হারেসা—উম্মে কারফা অভিমুখে (৮) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে আতীক, (৯) সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়হা, (১০) সারিয়াহ্-এ-কুরয ইবনে জাবের, (১১) সারিয়াহ্-এ-আমর আয-যাম্‌রী।
এই বৎসরের অভিযানসমূহের মধ্যে গায়ওয়াহ্-এ-হোদায়বিয়াই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ।

৭ম হিজরী

১টি মাত্র গায়ওয়াহ্ “গায়ওয়াহ্-এ-খায়বার সংঘটিত হইয়াছিল। যাহা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানসমূহের অন্যতম।

এবং ৫টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্-এ-আবু বকর, (২) সারিয়াহ্-এ-বিশ্ব ইবনে সা'দ, (৩) সারিয়াহ্-এ-গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ, (৪) সারিয়াহ্-এ-বশীর, (৫) সারিয়াহ্-এ-আহ্‌যাম।

৮ম হিজরী

৪টি গুরুত্বপূর্ণ গায়ওয়াহ্ সংঘটিত হইয়াছিল। যথা :

(১) গায়ওয়াহ্-এ-মু'তা, (২) মক্কা মুয়াযযামা বিজয়, (৩) গায়ওয়াহ্-এ-হোনাইন, (৪) গায়ওয়াহ্-এ-তায়েফ।

এবং ১০টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্-এ-গালিব—বনীল মুলাব্বিহ্ অভিমুখে, (২) সারিয়াহ্-এ-গালিব—ফাদাক অভিমুখে, (৩) সারিয়াহ্-এ-শুজা (৪) সারিয়াহ্-এ-কা'ব, (৫) সারিয়াহ্-এ-আমর ইবনুল আস্, (৬) সারিয়াহ্-এ-আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, (৭) সারিয়াহ্-এ-আবু কাতাদাহ্, (৮) সারিয়াহ্-এ-খালিদ-যাহাকে গুমায়সাও বলা হয়। (৯) সারিয়াহ্-এ-তোফায়ল ইবনে আমর দু'সী, (১০) সারিয়াহ্-এ-কাতবা (রাঃ)।

৯ম হিজরী

১টি মাত্র গায়ওয়াহ্ “গায়ওয়াহ্-এ-তাবুক” সংঘটিত হইয়াছিল—যাহা গুরুত্বপূর্ণ গায়ওয়াহ্‌সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এবং ৩টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা : (১) সারিয়াহ্-এ-আলকামা, (২) সারিয়াহ্-এ-আলী, (৩) সারিয়াহ্-এ-আক্কাশা (রাঃ)।

সন

গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্

১০ম হিজরী মাত্র ২টি সারিয়াহ্ প্রেরিত হইয়াছিল। যথা :

(১) সারিয়াহ্-এ-খালিদ ইবনে অলীদ—নাজরান অভিমুখে,

(২) সারিয়াহ্-এ-আলী—ইয়ামান অভিমুখে।

এই বৎসরই বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১১শ হিজরী এই বৎসর নবী করীম (দঃ) একটি মাত্র সারিয়াহ্ উসামা ইবনে য়ায়েদের নেতৃত্বে প্রেরণ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন—যাহা তাঁহার ওফাতের পর রওয়ানা হইয়াছিল।

গায়ওয়াহ্ মোট ২৩টি এবং সারিয়াহ্ মোট ৪৩টি

এখানে একটি কথা স্মরণযোগ্য যে, ইসলামের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় 'গায়ওয়াহ্' এবং 'সারিয়াহ্' শব্দ দুইটির প্রয়োগ এত সাধারণ যে, সামান্য সামান্য ঘটনাকেও গায়ওয়াহ্ এবং সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এক অথবা দুইজন লোক কোন অপরাধীকে গ্রেফতার করার জন্য প্রেরিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ ইহাকে সারিয়াহ্ নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিছু লোক কোন সাধারণ গোত্রের সংশোধন বা তাহাদের অবস্থার সংবাদ লওয়ার জন্য গেলে ইহাকেও সারিয়াহ্ বলা হইত।

এমনিভাবে গায়ওয়াহ্ শব্দের অর্থেও ঐতিহাসিকগণের পরিভাষায় বিরাট ব্যাপকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কারণেই গায়ওয়াহ্ ও সারিয়াহ্‌র মোট সংখ্যা উপরোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী ৬৬ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। নতুবা আমাদের প্রচলন অনুযায়ী জেহাদ এবং গায়ওয়াহ্ যে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকে মনে করা হয় তাহা এই সমস্ত যুদ্ধের কয়েকটিই মাত্র। এইগুলি সামান্য বিশ্লেষণসহ সুধী পাঠকের সম্মুখে পেশ করা হইল।

গুরুত্বপূর্ণ গায়ওয়াহ্ ও সারিয়াহ্ এবং বিবিধ ঘটনা :

প্রথম সারিয়াহ্ হযরত হামযার নেতৃত্বে :

হিজরতের ৭ মাস পরে রমযান মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত হামযাকে ত্রিশজন মুহাজেরের নেতা মনোনীত করিয়া একটি শ্বেত পতাকাসহ কুরাইশদের একটি

টিকা

১০ সীরাতে মোগলভাঙ্গি, পৃষ্ঠা ৪০। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, উক্ত সারিয়াহ্ দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রওয়ানা হইয়াছিল। অন্য আরেক রেওয়াজতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত সারিয়াহ্ গায়ওয়াহ্-এ-আবওয়ার পরে পাঠানো হইয়াছিল।

কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা যখন সমুদ্রের তীরে উপনীত হইয়া পারস্পরিক মোকাবেলায় লিপ্ত হইলেন, তখন মাজদী ইবনে ওমর জুহানী মধ্যস্থতা করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন।

সারিয়াহ্-ই-উবায়দা ইবনুল হারেস এবং

ইসলামে তীরান্দাজীর সূচনা :

ইহার পর নবী করীম (দঃ) ১ম হিজরী সনের শাওয়াল মাসে হযরত উবায়দা ইবনুল হারেসকে ৬০ জন লোকের নেতা মনোনীত করিয়া “বাতনে রাবেগ্” অভিমুখে আবু সুফিয়ানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধেই হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাঃ) প্রথম কাফেরদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করেন। ইহাই সর্বপ্রথম তীর যাহা ইসলামে কাফেরদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ■

দ্বিতীয় হিজরী

[কেবলা-পরিবর্তন, বদর যুদ্ধ, সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্ (রাঃ)]

কেবলা-পরিবর্তন :

এই বৎসর হইতে ইসলামের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। নবী করীম ছালাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের স্থলে কা'বা-শরীফকে মুসলমানদের কেবলা নির্ধারিত করা হয়। ইহাই পৃথিবীর প্রথম ঘর ও আদি মসজিদ। লোকজনকে একই দিকে মুখ করিয়া একাগ্রতার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে সমবেত করিবার জন্য ইহাকে কেবলা বা মনোযোগের কেন্দ্র বানানো হইয়াছে।

সারিয়াহ্-এ-আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্ এবং

ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমত :

এই বৎসর রজব মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ্কে ১২ জন মুহাজেরীনের একটি দলের নেতা মনোনীত করিয়া কুরাইশদের এক কাফেলার বিরুদ্ধে নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করিলেন। যেই দিম উভয় দল মুখোমুখি হইল, ঘটনাক্রমে সেই দিনটি ছিল রজব মাসের ১লা তারিখ। রজব হইতেছে সেই চারিটি নিষিদ্ধ মাসের একটি যাহাতে ইসলামের প্রথম দিকে যুদ্ধ-বিগ্রহ হারাম ছিল। কিন্তু সাহাবাগণ ঐ তারিখকে জমাদিউস-সানী মাসের ত্রিশ তারিখ (বলিয়া) মনে করিতেছিলেন। যেমন লুবাবুন নুকূল এবং বায়যাতী গ্রন্থে ইবনে জারীর, তাবরানী এবং বায়হাকী হইতে বর্ণিত হইয়াছে। পরামর্শের পর ইহাই

সিদ্ধান্ত হইল যে, লড়াই করিতে হইবে। অবশেষে যুদ্ধ হইল। বিরােধী দলের প্রধান নিহত হইল এবং দুইজন বন্দী হইল, আর অপরদিকেরা পালাইয়া গেল। মুসলমানগণ প্রচুর মালে গণীমত লাভ করিলেন যাহা আর্মারের সারিয়া জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন এবং এক-পঞ্চমাংশ বায়তুল মালের জন্য রাখিয়া দিলেন। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, এই সমস্ত মালে গণীমত লইয়া ছয় (৬)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, “আমি তো তোমাদিগকে শাহুরে হারাম অর্থাৎ রজব মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের নির্দেশ করি নাই।” অবশেষে এই মালে গণীমত তিনি বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই যুদ্ধের মালে গণীমতের সহিত বন্টন করিয়া দেন।

এই ঘটনা দ্বারা সমগ্র আরবে রটিয়া গেল যে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যাকাণ্ড বৈধ করিয়া দিয়াছেন। এই সময় পবিত্র কুরআনের আয়াত **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ** তাহাদের জওয়াবরূপে অবতীর্ণ হয়।

বদর যুদ্ধ :

বদর একটি কূপের নাম। ইহা পবিত্র মদীনা হইতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত। বদর নামে একটি গ্রামের আবাদীও সেখানে রহিয়াছে। এই ঐতিহাসিক জেহাদ সে স্থানেই সংঘটিত হইয়াছিল। ইহার সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ :

সুপ্রাচীন কাল হইতে সিরিয়ার সহিত কুরাইশদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহাল ছিল। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল তাহাদের সমস্ত গর্বাহংকার ও শক্তি-সামর্থ্যের প্রধান উৎস। তাই, রাজনৈতিক রীতি অনুযায়ী তাহাদের এই বাণিজ্যিক ধারাটিকে বন্ধ করিয়া দেওয়া ছিল অপরিহার্য। ইতিমধ্যে কুরাইশদের এক বিরাট বাণিজ্যিক কাফেলা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়া হইতে মক্কা আগমন করিতেছিল। নবী করীম (৬ঃ) এই সংবাদ পাইয়া ২য় হিজরী সনের ১২ই রমযানুল মোবারক মাত্র ৩১৪ জন নিরস্ত্র মুহাজের ও আনসার সাহাবীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের মোকাবেলার জন্য স্বয়ং গমন করিলেন। তিনি রাওহা নামক জায়গায় পৌঁছিয়া তাঁবু স্থাপন করিলেন (রাওহা মদীনার দক্ষিণ দিকে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম)। এইদিকে কুরাইশী কাফেলার নেতা এই সংবাদ অবহিত হইয়া চিরাচরিত রাস্তা পরিত্যাগ করিয়া কাফেলাসহ সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া মক্কার পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন অম্মারোহীকে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, যেন কুরাইশরা সর্বশক্তি লইয়া অতি শীঘ্র ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছে এবং তাহাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে রক্ষা করে। কুরাইশগণ প্রথম হইতেই মুসলমানদেরকে

সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা আঁটিতেছিল। এই সংবাদ মক্কায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ১০০ অশ্বারোহী এবং ৭ শত উট সমন্বয়ে গঠিত ৯৫০ জন বীর যুবকের এক বিরাট বাহিনী মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা হইল। এই বাহিনীতে কুরাইশদের বড় বড় সমস্ত নেতা এবং বিদ্বশালী ব্যক্তিদের সবাই শরীক ছিল।

সাহাবীদের আত্মোৎসর্গঃ

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের এই জঙ্গী বাহিনীর সংবাদ অবগত হওয়ামাত্র কর্তব্য স্থির করিবার উদ্দেশ্যে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় মিলিত হইলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেলাম স্ব স্ব জান-মাল নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করিয়া দিলেন। উমায়ের ইবনে ওকাস (রাঃ) তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন বলিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহারকে জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফলে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহারকে অনুমতি দিলেন এবং তিনিও জেহাদে শরীক হইলেন।

—কানযুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০

আনসারদের মধ্য হইতে খায়রাজ গোত্রের নেতা হযরত সাদ ইবনে উবাদা (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আল্লাহর কসম! আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত আছি।” —সহীহ মুসলিম

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত মিকদাদ আরম্ব করিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ডানে-বামে এবং সামনে ও পিছনে থাকিয়া যুদ্ধ করিব।” ইহাতে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তখন সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। বদরের নিকট পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন যে, আবু সুফিয়ান তাহার বনিকদলসহ নিরাপদে চলিয়া গিয়াছে। তবে কুরাইশদের এক বিরাট বাহিনী এই ময়দানেরই অপর প্রান্তে অবস্থান নিয়াছে। বাণিজ্যিক কাফেলাটি নিরাপদে চলিয়া যাওয়ার পরও আবু জাহুল লোকদিগকে যুদ্ধ স্থগিত না রাখারই পরামর্শ দিল।

মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের এই সিদ্ধান্তের সংবাদ অবগত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, কুরাইশরা আগেই পৌঁছিয়া এমন জায়গায় অবস্থান নিয়াছে যাহা যুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে খুবই উত্তম ছিল। পানির সকল ব্যবস্থাও সেই দিকেই ছিল। মুসলিম বাহিনী সেখানে পৌঁছিয়া তাহাদের দিকে এমন বালুকাময় শুক্ক জায়গা পাইল যে, ইহাতে চলাফেরাই ছিল দুষ্কর। তদুপরি সেখানে পানির চিহ্নমাত্র ছিল না।

অদৃশ্য-সাহায্য :

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো বিজয় ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াই দিয়াছিলেন। তাই তিনি এমন উপায় করিয়া দিলেন যে, তখনই বৃষ্টি বর্ষিত হইল। ফলে মরু বালুকা জমিয়া শক্ত হইয়া গেল। সমস্ত বাহিনী তৃপ্তির সহিত পানি পান করিলেন এবং অপরকে পান করাইলেন। পানির পাত্রসমূহ ভরিয়া রাখিলেন এবং চৌবাচ্চা বানাইয়া অবশিষ্ট পানি মাটিতে আটকাইয়া রাখিলেন। অপর দিকে এই বৃষ্টি কাফেরদের অবস্থানস্থল এমন কর্দমাক্ত করিয়া দিল যে, তাহাদের পক্ষে চলাফেরা করাও দুষ্কর হইয়া পড়িল। যখন উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হইল, তখন হুযূর (দঃ) যোদ্ধাদের কাতার ঠিক করার জন্য স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সূতরাং আল্লাহর এই বাহিনী সুদৃঢ় প্রাচীর হইয়া দাঁড়াইল।

মুসলমানদের অঙ্গীকার পূরণ :

এই সময় যখন তিনশত নিরস্ত্র মানুষের মোকাবেলা এক হাজার সুসজ্জিত ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সহিত সংঘটিত হইতে যাইতেছে, তখন যদি একটি লোকও তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে, তবে উহা যে এক বিরাট সৌভাগ্য বলিয়া মনে হইবে সেকথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু ইসলামে অঙ্গীকার পালন এই সব কিছুর চাইতে অগ্র-গণ্য। ঠিক যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে হযরত হোয়ায়ফা (রাঃ) ও আবু হাসান (রাঃ) নামে দুই সাহাবী জেহাদে অংশগ্রহণের জন্য আসিয়া পৌঁছান। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া রাস্তার ঘটনা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে, “পথে কাফেররা আমাদের পথরোধ করিয়া বলিল, ‘তোমরা কি মুহাম্মদ (দঃ)-এর সাহায্যের জন্য যাইতেছ?’ আমরা তাহা অঙ্গীকার করি এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিব না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া ফেলি।” নবী করীম (দঃ) যখন ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন, তখন উভয়কেই জেহাদে অংশ গ্রহণ করিতে বারণ করিয়া বলিলেন, “আমরা সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পালন করিব। আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্যই ঘটেছে।” —সহীহ মুসলিম

মোট কথা, যখন ব্যূহ-বিন্যাস সমাপ্ত হইয়া গেল, তখন সর্বাগ্রে কুরাইশদের পক্ষ হইতে তিনজন বীর আগাইয়া আসিল। মুসলমানদের পক্ষ হইতে হযরত আলী (রাঃ), হযরত হামযা (রাঃ) এবং হযরত উবায়দা ইবনুল হারেস (রাঃ) তাহাদের মোকাবেলা করিলেন। তিনজন কাফেরই নিহত হইল। মুসলমানদের মধ্যে শুধু হযরত উবায়দা (রাঃ) আহত হইলেন। হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নবী করীমের (দঃ) নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। নবী করীম (দঃ) তাঁহাকে নিজ কদম-মোবারকের সহিত ঠেস দিয়া শোয়াইলেন এবং স্বীয় পবিত্র হাতে তাহার মুখমণ্ডলের ধূলাবালি মুছিয়া দিলেন। কবি কি চমৎকার বলিয়াছেন :

সাহাবাদের নিশ্চয়কর আত্মভাগ :

যখন উভয় বাহিনীর সৈন্যরা পরস্পর মুখোমুখি হইল, তখন দেখা গেল, নিজেদেরই অনেক স্নেহ-ভাজন কলিজার টুকরা তরবারীর নীচে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই হিব্বুল্লাহর বিশ্বাস ছিল,

مزار خویش که بیگا نه از خدا باشد
فدائے یک تن بیگا نه کا شنا باشد

“সহস্র আত্মীয়ে মোর যারা কর্ম-দোষে
ভুলে আছে বিধাতারে অবহেলা বশে।
উৎসর্গ করি সেই মহাজন পরে
প্রভু সনে রাখে ভাব স্মরিছে প্রভুরে।”

সুতরাং যখন হযরত সিদ্দীকে আকবরের পুত্র (যিনি তখনও কাফের ছিলেন) ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন, তখন স্বয়ং হযরত সিদ্দীকে আকবরের তরবারী তাহার দিকে উত্থিত হইল। উতবা সম্মুখে আসিলে তাহারই পুত্র হযরত হোষায়ফা (রাঃ) তরবারী উচাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত ওমরের মামা ময়দানে অগ্রসর হইলে ফারুকী তরবারী স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দিল।

—সীরাতে ইবনে হিশাম ও ইসতিয়াব আব্দুল বার, শঃ

অনন্তর তুমুল যুদ্ধ শুরু হইল। একদিকে যুদ্ধ চরম ও ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে আর অন্যদিকে রাসূলকুল সর্দার (দঃ) সিজ্দায় পড়িয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। অবশেষে গায়েবী সুসংবাদ তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

আবু-জাহলের পতন :

যেহেতু আবু-জাহলের দুর্কর্ম ও ইসলাম-বিদ্বেষ সর্বজন বিদিত ছিল, তাই আনসারদের মধ্য হইতে হযরত মুআওয়েয (রাঃ) ও হযরত মুআয (রাঃ) এই দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আবু জাহলকে দেখিবামাত্র হয় তাহাকে হত্যা করিবেন, না হয় নিজেরাই শহীদ হইয়া যাইবেন। এই সুযোগে দুই ভাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনে আগাইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহারা আবু জাহলকে চিনিতেন না। সুতরাং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নিকট তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তিনি ইঙ্গিতে তাহাকে দেখাইয়া দেওয়ামাত্র দুই ভাই বাজ পাখির ন্যায় তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে আবু জাহল শোণিত-সিক্ত মস্তিকায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। আবু জাহলের পুত্র ইকরামা (যিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন) পিছন দিক হইতে আসিয়া মুআযের কাঁধে তরবারীর আঘাত হানিল। ইহাতে তাঁহার একটি বাহু কাটিয়া গেল, কিন্তু সামান্য চামড়া লাগিয়া

রহিল। মুআয ইকরামাকে ধাওয়া করিলেন কিন্তু সে পালাইয়া গেল। অতঃপর মুআয এই অবস্থায় তাহার কর্তিত বাহু লইয়াই ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্তিত বাহুটি বুলিয়া থাকায় অসুবিধা হইতেছিল। কাজেই হাতখানি পায়ের নীচে রাখিয়া সজোরে টান দিলেন। তাতে চর্মাংশটি ছিড়িয়া হাতটি খসিয়া গেল। তারপর পূর্বের ন্যায়ই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। সুবহানাল্লাহ্ !

—সীরাতে হালবীয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৪

আজীমুশশান মো'জেযা :

[মুষ্টিভর মুন্ডিকায় বিশাল বাহিনীর পরাজয় ও ফেরেশতাকুলের সাহায্য]

যুদ্ধের চরম মুহূর্তে নবী করীম (দঃ) আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে এক মুষ্টি কঙ্কর হাতে লইয়া শত্রুবাহিনীর প্রতি নিষ্ক্ষেপ করিলেন এবং সাহাবাগণকে একযোগে তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে নির্দেশ দিলেন।

এইদিকে বাহিক ব্যবস্থা হিসাবে সাহাবাদের ক্ষুদ্র বাহিনী কাফেরদের প্রতি ধাবিত হইল আর অপর দিকে মহান আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সাহায্যার্থে ফেরেশতা-বাহিনী পাঠাইয়া স্বীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করিলেন।

কুরাইশদের বড় বড় নেতা নিহত হইলে অন্যান্যদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহারা দিশাহারা হইয়া পলাইতে লাগিল। মুসলমানগণ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের কাহাকেও হত্যা করিলেন আর কাহাকেও জীবিত বন্দী করিলেন। এইভাবে তাহাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হইল। কুরাইশদের বড় বড় নেতা উতবা, শায়বা, আবু জাহ্ল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, ওক্বা—একে একে নিহত হইল।

এইদিকে মুসলমানদের মধ্য হইতে শহীদ হইলেন ১৪ জন। ৬ জন মুহাজের আর ৮ জন আনসার।

হুশিয়ারি :

এই যুদ্ধটি প্রকৃতপক্ষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ইসলামের একটি প্রকাশ্য মো'জেযা বই কিছু ছিল না। নতুবা ইহাতে মুসলমানদের বিজয়ের কোন প্রশ্নই উঠিত না। কেননা, সেইদিকে ছিল এক হাজার দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের এক বিশাল বাহিনী আর এইদিকে মাত্র ৩১৪ জন নিরীহ ও নিরস্ত্র মানুষ। সেইদিকে ছিল বড় বড় ধনী ও বিত্তশালীদের বিপুল সমাবেশ—যাহাদের যে কোন একজন লোকই সমগ্র বাহিনীর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। আর এইদিকে নিঃসম্বল ও দরিদ্র মানুষের জামাত। সেইদিকে শতাধিক অস্পারোহীর সমাবেশ আর এইদিকে সারা মুসলিম

বাহিনীতে ২টি মাত্র ঘোড়া। সেইদিকে সর্বপ্রকার সমরাত্তরের বিপুল সমাবেশ আর এইদিকে মাত্র গুটিকয়েক তরবারী।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের বিস্ময়ের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চায় না যে, এমনটি কেমন করিয়া হইতে পারে? কিন্তু তাহারা জানে না, জয়-পরাজয় এবং সফলতা ও বিফলতা ঘোড়া, তরবারী আর ধন-সম্পদের এখতিয়ারাধীন নহে। বরং ইহাতে অন্য কোন অদৃশ্য হাতের ভূমিকা সক্রিয় রহিয়াছে। কিন্তু এইসব বাহ্যিক উপকরণে বিশ্বাসী এবং বিদ্যুৎ ও বাষ্পের পূজারীদের পক্ষে এই রহস্য উন্মোচন করা কেমন করিয়া সম্ভব? কবি আকবর এলাহাবাদী কি সুন্দর বলিয়াছেন—

جهوڑ کر بیٹھا ہے یورپ اسمانی باپ کو
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بہا پ کو

“ইউরোপ আজ ছেড়ে বসে আছে
নভোজগতের পিতাকে তার।
বিদ্যুৎ আর বাষ্পকে তারা
দানিছে আসন খোদা-তা'আলার।”

যুদ্ধ-বন্দীদের সহিত মুসলমানদের আচরণ :

সভ্যতার দাবীদার ইউরোপীয়দের জন্য শিক্ষা :

বদরের যুদ্ধ-বন্দীরা যখন মদীনায় পৌঁছিল, তখন নবী করীম (দঃ) তাহাদিগকে দুইজন চারজন করিয়া সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন এবং ইহাদেরকে আরামে রাখিবার জন্য সকলকে নির্দেশ দান করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া এই হইল যে, সাহাবাগণ বন্দীদের আহরাদির সযত্ন ব্যবস্থা করিতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খাইয়া কাটাইতেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়র (রাঃ)-এর ভাই আবু আযিযও এই বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, “আমাকে যে আনসারীর তদ্বাবধানে দেওয়া হইয়াছিল, তিনি খাবার আনিয়া রুটির পাত্রটি আমার সামনে রাখিয়া দিতেন আর নিজে শুধু খেজুরের উপর নির্ভর করিতেন।” —তাবারী

যুদ্ধ-বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সহিত পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল যে, মুক্তি-পণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং চার চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ লইয়া বন্দীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

ইসলামী সমতা :

এই কয়েদীদের মধ্যে হযূর (দঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাসও ছিলেন। (তিনি পরে মুসলমান হইয়াছিলেন)। হযরত আব্বাস রাতের বেলায় শৃঙ্খলের যাতনায়

কাতরাইতেছিলেন। তাঁহার এই যত্নগা-কাতর ধনী নবী করীম (দঃ)-এর কানে প্রবেশ করিলে তাঁহার নিদ্রা টুটিয়া গেল। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার নিদ্রা কেন আসিল না?” হুযর (দঃ) বলিলেন, “আমি কেমন করিয়া ঘুমাইতে পারি, যেখানে আমার মাননীয় পিতৃবোর যত্নগা-কাতর ধনী আমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে।” —কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭২

এইসব কিছু ছিল, কিন্তু ইসলামের সমতা ইহার অনুমতি প্রদান করিতেছিল না যে, তাঁহার সম্মানিত ও বয়োবৃদ্ধ পিতৃব্যকে বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। যেভাবে সকলের নিকট হইতে মুক্তিপণ আদায় করা হইয়াছে তাঁহার নিকট হইতেও তদ্রূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। বরং সাধারণ বন্দীদের তুলনায় কিছু বেশীই আদায় করা হইয়াছে। কেননা সাধারণ বন্দীদের নিকট হইতে চার হাজার এবং বিত্তবানদের নিকট হইতে কিছু বেশী করিয়া আদায় করা হইয়াছিল। হযরত আব্বাসও ছিলেন ধনী লোক। সুতরাং তাঁহাকেও চারি হাজার দিরহামের চাইতে বেশী প্রদান করিতে হইয়াছিল।

হযরত আব্বাসের মুক্তি-পণ মাফ করিয়া দেওয়ার জন্য আনসারগণ আবেদনও জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইসলামী সমতার বিধানে আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং শত্রু-মিত্র সবাই সমান ছিল। কাজেই আনসারদের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহা গৃহীত হয় নাই। এমনিভাবে নবী করীম (দঃ)-এর জামাতা আব্বুলআসও যুদ্ধ-বন্দী হইয়া আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার নিকট মুক্তিপণ আদায় করিবার মত অর্থ ছিল না। ফলে তিনি তাঁহার সহ-ধর্মিণী অর্থাৎ হুযর (দঃ)-এর কন্যা হযরত জয়নাবকে (যিনি মক্কায় বসবাস করিতেছিলেন) মুক্তি-পণের অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিতে বলিয়া পাঠাইলেন। সুতরাং তিনি তাঁহার মাতা হযরত খাদীজাপ্রদত্ত তাঁহার বিবাহের যৌতুকের হারখানাই মুক্তিপণ হিসাবে পাঠাইয়া দিলেন। যখন এই হারখানা হুযরের (দঃ) দৃষ্টিগোচর হইল, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। তিনি সাহাবাগণকে বলিলেন, “যদি তোমরা সম্মত হও তাহা হইলে যয়নাবের নিকট তাহার মাননীয় জননীর পবিত্র স্মৃতি এই হারখানা ফেরত পাঠাইয়া দাও।” সাহাবাগণ সানন্দে রাজী হইয়া হারখানা ফেরত পাঠাইয়া দিলেন এবং আব্বুল আস্কে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন হযরত যয়নাবকে মদীনায়া পাঠাইয়া দেন।

—মিশকাত পৃষ্ঠা ৩৪৬

আব্বুল আসের ইসলাম গ্রহণঃ

আব্বুল আস্ (রাঃ) মুক্তি লাভ করিয়া মক্কা পৌঁছিলেন এবং শর্ত-অনুযায়ী হযরত যয়নাবকে মদীনায়া পাঠাইয়া দিলেন। আব্বুল আস্ একজন বিরাত বাবসায়ী ছিলেন।

দটনাক্রমে দ্বিতীয় বার পুনরায় সিরিয়া হইতে বাণিজ্য-পণ্য নিয়া আসার সময় বৃত্ত হইলেন এবং তারপর ঠিক এমনিভাবে মুক্তি লাভ করিলেন। এইবার ছাড়া পাইয়া নক্সা আগমন পূর্বক অংশীদারদের সহিত সকল হিসাব-নিকাশ চুকাইয়া ফেলিলেন এবং মুসলমান হইয়া গেলেন। তারপর লোকজনকে বলিলেন, “আমি এই জন্য এখানে আসিয়া মুসলমান হইলাম, যেন কেহ বলিতে না পারে যে, আবুল আস আমাদের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করিয়া তাগাদার ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে অথবা তাহাকে বলপূর্বক মুসলমান বানানো হইয়াছে।” —তরীখে তাবারী. শঃ

বদরের বন্দীগণের নিকট পরিধেয় ছিল না। হুযুর ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের সকলের জন্য কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু হযরত আব্বাস এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, কাহারো জামা তাঁহার গায়ে লাগিতেছিল না। তখন মুনাফিক-নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজের জামাটি খুলিয়া তাঁহাকে দিয়া দিল। নবী করীম (দঃ) পরবর্তীকালে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কাফনের জন্য নিজের যে জামাটি প্রদান করিয়াছিলেন সেখানে সেই উপকারের প্রতিদানও অনেকটা বিবেচ্য ছিল।

—ছহীহ বোখারী

ইসলামী রাজনীতি এবং শিক্ষার উন্নতি :

যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে যাহারা মুক্তিপণ আদায় করিতে সক্ষম ছিল না কিন্তু অল্প-বিস্তর লেখাপড়া জানিত তাহাদিগকে বলা হইল, তোমরা মুসলমানদের দশ দশটি ছেলে-মেয়েকে লেখা শিখাইয়া দিবে। ইহাই তোমাদের মুক্তিপণ। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) এইভাবেই লেখা শিখিয়াছিলেন।

এই বৎসরের বিবিধ ঘটনা :

এই বৎসর রবিবার দিন যখন হুযুর (দঃ) বদরের যুদ্ধ শেষে মদীনায ফিরিয়া আসিলেন, তখন লোকজন তাঁহার কন্যা হযরত রোকাইয়ার দাফনকার্য সম্পন্ন করিয়া হাত-পা পরিষ্কার করিতেছিলেন। —মোগলতাই

এই বৎসরই বদর যুদ্ধ হইতে ফিরিবার পর সর্বপ্রথম ঈদুল ফিতরের নামায পড়া হয়। রমযানের রোযা, সদ্কাতুল ফিতর এবং যাকাতও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। ঈদুল আযহার নামায এবং কোরবানীও এই বৎসরই ওয়াজিব হয়। এই বৎসরই ফিলহাজ্জ মাসে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। —মোগলতাই

তৃতীয় হিজরী

[গায়ওয়াহ্-এ-উছদ ও গাত্ফান প্রভৃতি]

গায়ওয়াহ্-এ-গাত্ফান এবং নবী করীম (দঃ)-এর

মহান চরিত্র-সংক্রান্ত মো'জেষা :

হিজরী ৩য় সালে দা'সুর ইবনে হারেস মুহারিবী ৪৫০ জন সৈন্য লইয়া পবিত্র মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধা দেওয়ার জন্য অগ্রসর হইলে তাহারা পালাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ছয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিন্তে ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় ঘটনাক্রমে বৃষ্টিতে তাঁহার কাপড় ভিজিয়া যায়। তিনি তাহা শুকাইবার জন্য খুলিয়া একটি গাছের উপর বিছাইয়া দিলেন এবং নিজে ইহার ছায়ায় শুইয়া পড়িলেন। দা'সুর পাহাড়ের উপর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছিল। যখন দেখিল, নবী করীম (দঃ) নিশ্চিন্তে শুইয়া পড়িয়াছেন, তখন সে সরাসরি তাঁহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তরবারী উচাইয়া বলিতে লাগিল—

“বল, এখন তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে?” কিন্তু তাহার প্রতিপক্ষ ছিলেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল! কোন প্রকার ভীত না হইয়া তিনি উত্তর দিলেন, “হাঁ, আল্লাহ তা'আলাই রক্ষা করিবেন।” এই কথা শোনামাত্র দা'সুরের গায়ে কম্পন সৃষ্টি হইল এবং তরবারীটি হাত হইতে খসিয়া পড়িল। তখন নবী করীম (দঃ) তরবারীখানা তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, “এখন তুমি বল, তোমাকে আমার হাত হইতে কে রক্ষা করিবে?” তাহার নিকট “কেহই না” বলা ছাড়া আর কোন উত্তরই ছিল না। রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই করুণ-দশা দেখিয়া দয়ায় গলিয়া গেলেন এবং তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিলেন।

—সীরাতে মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৪৯

দা'সুর এখন হইতে এই প্রতিক্রিয়া নিয়া উঠিল যে, সে নিজেই শুধু ইসলাম গ্রহণ করিল না, বরং নিজের গোত্রে পৌঁছিয়া ইসলামের একজন শক্তিশালী প্রচারকে পরিণত হইল।^১

টিকা

১০ চামচিকার চোখ দিয়া অবলোকনকারী প্রতিবাদী ইউরোপীয় জাতির নয়ন মেলিয়া দেখুক যে, ইসলাম প্রচারের কারণ এই উত্তম চরিত্র ছিল—না কি তরবারীর শক্তি, না সম্পদের লোভ।

دل مين سماكنى قيايمت كى شوخيائى : دوچار دن رهے تھے كسى كى نگاه ميں

“অন্তরে মম জ্বলিছে আল দর্শনার

টার চোখে চোখে থেকেছিল বলে দিবস চার।”

হযরত হাফসা ও যয়নাবের সহিত বিবাহ :

নবী করীম (দঃ) হিজরী ৩য় সনের শাবান মাসে উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফসার সহিত এবং একই সনের রমযান মাসে হযরত যয়নাব বিনতে খোযায়মার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। —মোগলতান্ত্র

উহুদ-যুদ্ধ :

উহুদ মদীনার অদূরে একটি পাহাড়। যে স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তথায় হযরত হারুন (আঃ)-এর কবর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যুদ্ধ মুহাদ্দিসগণের সর্ব-সম্মত মতানুসারে হিজরী ৩য় সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হইয়াছিল। তবে ইহার তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। যথাঃ ৭, ৮, ৯, ১০, ১১ ইত্যাদি।

—যুরকানী শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০

বদর যুদ্ধে পরাজিত মুশ্‌রেকদের জন্য যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটাইয়া উঠিতে এবং নিহত আত্মীয়-স্বজনের শোক বিস্মৃত হইতে এক বৎসর সময় মোটেও যথেষ্ট ছিল না। তবুও বৎসরান্তে যখন তাহারা কিছুটা সংবিৎ ফিরিয়া পাইল, তখন তাহাদের মনে প্রতিশোধের আশু দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সুতরাং এইবার তাহারা অত্যন্ত নিখুত প্রস্তুতি নিয়া মদীনা আক্রমণের সংকল্প করিল এবং এই লক্ষ্যে তিন সহস্রাধিক যোদ্ধার সুসজ্জিত বাহিনী লইয়া মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। এই বাহিনীতে ছিল ৭ শত বর্ম, ২ শত অশ্ব এবং ৩ সহস্র উট। ১৪ জন মহিলাকেও তাহারা এই উদ্দেশ্যে সঙ্গে করিয়া নিয়া আসিয়াছিল যে, ইহারা পুরুষদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বেজিত করিবে আর পলায়ন করার অবস্থায় তিরস্কার করিয়া লজ্জা দিবে।

এইদিকে নবী করীম (দঃ)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) যিনি মুসলমান হইয়া থাকিলেও এখন পর্যন্তও মক্কায়ই অবস্থান করিতেছিলেন—যথাশীঘ্র সমুদয় ঘটনা ও অবস্থা লিখিয়া একজন দ্রুতগামী দূতের মাধ্যমে হযুরের পাক (দঃ)-এর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। হযুর (দঃ) খবর পাওয়ার পর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাত দুইজন লোক পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে, কুরাইশ-বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে। যেহেতু শহরের উপর আক্রমণের আশংকা ছিল, তাই চতুর্দিকে পাহারার ব্যবস্থা করা হইল। ভোরে সাহাবায়ে কেরামের সহিত পরামর্শের পর ১ হাজার সাহাবীর এক বাহিনী লইয়া

মদীনার বাহিরে আগমন করিলেন। ইহাদের মধ্যে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার ৩ শত সমমনা মুনাফিকও ছিল। কিন্তু উহাদের সবাই পশ্চিমপাশ্চ ফিরিয়া গেল। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা রহিল মাত্র ৭ শত।

সেনা বাহিনী বিন্যাস এবং অল্প বয়স্ক

সাহাবা-তনয়দের জেহাদের স্পৃহা :

মদীনা হইতে বাহির হইয়া যখন সেনা বাহিনীর চূড়ান্ত হিসাব লওয়া হইল তখন অল্প বয়স্ক বালকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কিশোরদের মাঝে জেহাদের স্পৃহা এত প্রবল ছিল যে, যখন রাফে' ইবনে খাদীজকে বলা হইল, “তোমার বয়স কম, তুমি ফিরিয়া যাও।” তখন তিনি পায়ের পাতায় ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইলেন, যেন তাঁহাকে লম্বা মনে করা হয়। সূতরাং তাঁহাকে জেহাদে লওয়া হইল।

সামুরা ইবনে জুনদুব যিনি রাফে' ইবনে খাদীজের সম-বয়সী ছিলেন। তিনি যখন উপরোক্ত ঘটনা দেখিলেন, তখন আরম্ভ করিলেন যে, আমি তো রাফে'কে কুস্তিতে ধরাশায়ী করিয়া দিতে পারি। যদি তাহাকে জেহাদে লওয়া হয়, তবে আমাকে আরো উত্তম কারণে আগেই লওয়া উচিত। তাহার কথায় উভয়কে কুস্তি প্রতিযোগিতায় লাগাইয়া দেওয়া হইল। সামুরা রাফে'কে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। ফলে, তাহাকেও জেহাদে গ্রহণ করা হইল। — তাবারী, ৩য় খণ্ড

যে সকল লোক দাবী করে যে, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহারা এই মুসলিম কিশোরদের আত্ম-ত্যাগ দর্শন করিয়া নিজেদের মিথ্যা বটনার জন্য কি লজ্জিত হইবে না?

যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছিয়া নবী করীম (দঃ) বাহ বিন্যাস করিলেন। উহুদ পাহাড়টি ছিল পিছনের দিকে। কাজেই সেই দিক হইতে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। তিনি ৫০ জন তীরন্দাজকে পাহাড়ের উপর প্রহরায় মোতায়েন করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, “মুসলমানদের জয় হউক কিংবা পরাজয় হউক তোমরা কোন অবস্থাতেই নিজেদের অবস্থান হইতে নড়িবে না।”

যুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। দীর্ঘক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর যখন কাফের সৈন্য পিছুটান দিতে লাগিল, তখন মুসলমানের অবস্থা সন্তোষজনক দেখাইতেছিল। কুরাইশ্রা আতংকগ্রস্ত অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল। মুসলমানগণ গণীমাতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহা দেখামাত্র ঐ সব লোকও তাহাদের স্বীয় অবস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে চলিয়া আসিলেন, যাহাদিগকে নবী করীম (দঃ) পিছনের পাহাড়ের উপর প্রহরায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর অনেক

ধারণা করিলেন, কিন্তু তাহারা আর এখানে প্রহরায় থাকার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া এথা হইতে সরিয়া আসিলেন। এখানে কয়েকজন মাত্র সাহাবী বহিয়া গেলেন।

এই অবস্থা দেখিয়া খালেদ ইবনে ওলীদ (যিনি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এবং কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিলেন) পশ্চাদ্ধিক হইতে অতিক্রমণ করিয়া বসিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর এবং তাঁহার অর্ধশত গুটিকয়েক সঙ্গী প্রাণপণ লড়াই করিয়া অবশেষে সকলেই শাহাদত বরণ করিলেন। যখন রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গেল, তখন খালিদ তাহার বাহিনী লইয়া পশ্চাদ্ধিক হইতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং উভয় ফৌজ এমনভাবে সংঘবদ্ধ হইয়া গেল যে, মুসলমানগণ স্বয়ং মুসলমানদের হাতেই শহীদ হইতে লাগিলেন।

হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রাঃ) শাহাদত বরণ করিলেন। যেহেতু ছয়র (দঃ)-এর চেহারার সহিত তাঁহার অনেকটা সাদৃশ্য ছিল, তাই তাঁহার শাহাদতকে কেন্দ্র করিয়া নবী করীম (দঃ)-এর শহীদ হওয়ার গুজব ছড়াইয়া পড়িল। কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে যে, জনৈক শয়তান অথবা জনৈক মশারেক অতি উচ্চস্বরে "মুহাম্মদ (দঃ) নিহত হইয়াছেন" বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল।

—যুরকানী, শরহে মাওয়াহিব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা ছড়াইয়া পড়িল। বড় বড় খাতনামা বীরদের পা টলটলায়মান হইয়া গেল। তবুও অনেক বীর যোদ্ধা তখনও প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি গভীর আগ্রহে ঐ কাবায়ে মাকসুদ অর্থাৎ নবী করীম (দঃ)-কে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। সকলের আগে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) ছয়র (দঃ)-কে দেখিতে পাইলেন। তিনি আনন্দে উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মোবারক হউক—রাসূলুল্লাহ (দঃ) নিরাপদে এখানেই আছেন।"

এই খবর শোনামাত্র সাহাবায়ে কেরাম ছয়র (দঃ)-এর দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। কিন্তু সাথে সাথে কাফেররাও সকল দিক হইতে সরিয়া আসিয়া এই দিকেই তাহাদের আক্রমণ জোরদার করিল। বেশ কয়েকবার ছয়র (দঃ)-এর উপর আক্রমণ হইল কিন্তু তিনি নিরাপদেই রহিলেন।

একবার কাফেররা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করিল। তখন ছয়র (দঃ) বলিলেন, "কে আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত?" ইহা শোনার সাথে সাথে হযরত যিয়াদ ইবনে মাকান চারজন আসহাব সহ আগাইয়া আসিলেন এবং সকলেই প্রাণপণ লড়াই করিয়া শহীদ হইলেন। হযরত যিয়াদ যখন আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন, তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন, "তাঁহার লাশ নিকটে নিয়া আস।" লোকেরা

তাঁহাকে উঠাইয়া নিয়া আসিলেন। তাঁহার দেহে তখনও কিছুটা প্রাণস্পন্দন অবশিষ্ট ছিল। তিনি হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র চরণের উপরে মুখ রাখিলেন এবং সেই অবস্থায়ই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সুবহানাল্লাহ!

নবী করীম (দঃ)-এর নূরানী চেহারা আহত হওয়া :

কুরাইশদের বিখ্যাত বীর আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ কাতার ডিঙাইয়া সম্মুখে আসিল এবং নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র চেহারার উপর তরবারীর আঘাত হানিল। ইহাতে শিরস্ত্রানের দুইটি কড়া হুযুর (দঃ)-এর পবিত্র চেহারার ভিতরে ঢুকিয়া গেল এবং একখানা পবিত্র দাঁত শহীদ হইয়া গেল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) শিরস্ত্রানের কড়া যখম হইতে বাহির করিবার জন্য অগ্রসর হইলে হযরত আবু উবায়দা ইবনুল্ জাররাহ কসম দিয়া বলিলেন, “আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই খেদমতটুকু আমাকে করিবার সুযোগ দিন।” এই বলিয়া তিনি সামনে অগ্রসর হইলেন এবং হাতের পরিবর্তে মুখ দিয়া সেই কড়া দুইটি বাহির করিয়া আনিবার জন্য সজোরে টান দিলেন। ইহাতে প্রথম বারে একটি কড়া বাহির হইয়া আসিল কিন্তু সাথে সাথে হযরত উবায়দার একটি দাঁতও ভাঙ্গিয়া গেল। ইহা দেখিয়া দ্বিতীয় কড়াটি বাহির করিবার জন্য হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) পুনরায় অগ্রসর হইলে এইবারও আবু উবায়দা (রাঃ) তাঁহাকে কসম দিয়া বাধা দিলেন এবং নিজেই দ্বিতীয়বার এমনিভাবে হাতের পরিবর্তে মুখ দিয়া দ্বিতীয় কড়াটি টানিয়া বাহির করিলেন। উহার সঙ্গে আবু উবায়দার দ্বিতীয় দাঁতটিও ভাঙ্গিয়া গেল।

—ইবনে হাব্বান, তাবরানী, দারেকুতনী প্রভৃতি, কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪

কাফেরকূল মুসলমানদের জন্য কতিপয় গর্ত খনন করিয়া রাখিয়াছিল। নবী করীম (দঃ) উহাদের একটির ভিতরে পড়িয়া গেলেন।

সাহাবাদের আত্মোৎসর্গ :

ইহা দেখিয়া আত্মত্যাগী সাহাবাগণ নবী করীম (দঃ)-কে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। চতুর্দিক হইতে তীর আর তরবারীর বৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু সাহাবাগণ এই সমস্ত আঘাতকে নিজেদের উপরে গ্রহণ করিতেছিলেন। হযরত আবু দাজানা (রাঃ) ঝুকিয়া হুযুর (দঃ)-এর জন্য ঢাল স্বরূপ হইয়া গেলেন। যেই দিক হইতেই তীর আসিত উহা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে পতিত হইত। হযরত ভালহা (রাঃ) তীর আর তরবারীর আঘাতসমূহকে নিজের দেহ পাতিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন। ফলে, তাঁহার একটি হাত কাটিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। যুদ্ধের পরে গণনা করিয়া দেখা গেল, তাঁহার দেহে ৭০টিরও অধিক আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে।

—ইবনে হাব্বান ইত্যাদি, কানযুল উম্মাল ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৮

হযরত আবু তালহা একটি ঢালের সাহায্যে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করিতেছিলেন। হযর (দঃ) যখন মাথা উঠাইয়া সৈন্য বাহিনীর দিকে তাকাইতেন, তখন আবু তালহা বলিতেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি দয়া করিয়া মাথা উঠাইবেন না। শত্রুদের নিষ্ক্রিয় কোন তাঁর যেন আপনার দেহ মোবারকে না লাগে। ইহার জন্য আপনার পূর্বে আমারই বক্ষ প্রস্তুত রহিয়াছে।”

—বোখারী, গায়ওয়া-এ-উহুদ

একজন সাহাবী আরম্ভ করিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যদি মারা যাই তাহা হইলে আমার ঠিকানা কোথায় হইবে?” হযর (দঃ) বলিলেন, “বেশেহতে।” এই সাহাবী কয়েকটি খেজুর হাতে লইয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন। ইহা শুনামাত্র খেজুরগুলি ফেলিয়া দিলেন এবং সোজা শত্রুদের ভিড়ে ঢুকিয়া প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন। —বোখারী, গায়ওয়া-এ-উহুদ

দুর্ভাগা কুরাইশরা অত্যন্ত নির্মমভাবে নবী করীম (দঃ)-এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু রাহ্মাতুল-লিল-আলামীন (দঃ)-এর যবান মোবারক হইতে তখন শুধু এই কথা কয়টিই উচ্চারিত হইতেছিল : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“ইয়া আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করিয়া দিন; তাহারা জানে না।”

—ফতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৬, পৃষ্ঠা ৪৮ : গায়ওয়া-এ-উহুদ

তাহার উজ্জ্বল চেহারা হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল এবং আপাদমস্তক করণার নবী (দঃ) কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা তাহা মুছিতেছিলেন আর বলিতেছিলেন, “এই রক্তের একটি ফোটাও যদি যমীনে পতিত হইত তাহা হইলে সকলের উপরে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হইয়া যাইত।”

—ফতহুল বারী, গায়ওয়া-এ-উহুদ

এই যুদ্ধে কাফেরদের মাত্র ২২ জন বা ২৩ জন নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৭০ জন শাহাদত বরণ করেন।

চতুর্থ হিজরী

বী'র মাউনা অভিমুখে সারিয়াহ-এ-মুনযির (রাঃ) :

এই বৎসরই সফর মাসে নবী করীম (দঃ) সম্ভরজন সাহাবার এক দলকে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নাজদবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে বড় বড় খালেম সাহাবীও ছিলেন। সেখানে পৌঁছার পর আমের, রাল, যাকওয়ান, উসাইয়া প্রভৃতি গোত্র তাহাদের মোকাবেলা করিলে উদ্যত ওইল। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হইল

এবং ঘটনাক্রমে সকল সাহাবাই শাহাদত বরণ করিলেন। নবী করীম (দঃ) এই ঘটনায় খুবই মর্মান্ত হইলেন। এমনকি তিনি এই ঘটকদের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত ফজরের নামাযে বদ দেওয়া করেন। —সারাজে মোগলতঙ্গি, পৃষ্ঠা ৫২

এই বৎসরই শাওয়াল মাসে হযরত হাসান (রাঃ) ভূমিষ্ঠ হন এবং হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম (দঃ)-এর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

পঞ্চম হিজরী

[কুরাইশ-ইহুদী সম্মিলিত যড়যন্ত্র এবং গাযওয়াহ্-এ-আহযাব]

কুরাইশ-ইহুদী ঐক্য :

নবী করীম (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন এখানকার ইহুদীদের সহিত একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করেন। তিনি সর্বদা এই চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু যেহেতু ইহুদীরা পবিত্র মদীনার বিস্তারিত ও শীর্ষস্থানীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য ছিল, তাই হযূর (দঃ)-এর আগমনের পর ইসলামের ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের মনে প্রবল হিংসা-ক্ষোভের সৃষ্টি হইত। এইজন্যই তাহারা সর্বদা নবী করীম (দঃ) ও মুসলমানগণের অনিষ্ট চিন্তায় লাগিয়া থাকিত।

বদর যুদ্ধে মুসলমানগণ বিস্ময়কর বিজয় অর্জন করায় ইহুদীদের হিংসা ও ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। শেষ পর্যন্ত তাহারা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি লঙ্ঘনে তৎপর হইল। অনন্তর হিজরী তৃতীয় সালে তাহাদের গোত্র বনী-কায়নুকা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল। পরে বনী-নাযীর গোত্রও বিদ্রোহ শুরু করিয়া দিল। ইহা দেখিয়া নবী করীম (দঃ)-ও যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করিলেন এবং মোকাবেলা হইলে তাহারা পালাইয়া দুর্গে আত্মগোপন করিল। কিছুদিন এইভাবে অবরুদ্ধ থাকার পর দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বনী কায়নুকা সিরিয়া এলাকায় এবং বনী নাযীর খায়বার ও অন্যান্য জায়গায় চলিয়া গেল।

এই দিকে মক্কার কুরাইশগণ প্রথম হইতেই মদীনার ইহুদী ও মুনাফেকদিগকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে শুধু যে নবী করীম ছালাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণের ইচ্ছনই যোগাইতেছিল, তাহাই নহে; বরং সঙ্গে সঙ্গে এই হুমকীও দিয়া আসিতেছিল যে, যদি তোমরা মুহাম্মদ (দঃ)-কে মদীনা হইতে বহিষ্কার করিয়া না দাও, তাহা হইলে আমরা তোমাদের সঙ্গেও যুদ্ধ করিব। —আবু দাউদ

উপরোক্ত কারণগুলিই তাহাদের পারস্পরিক ঐক্য ও সেতু-বন্ধনের কাজ করিল এবং এই সুযোগে মক্কার কুরাইশ, মদীনার ইহুদী আর মুনাফেকদের সম্মিলিত শক্তি

ঈসলামের বিরুদ্ধে তৎপর হইয়া মক্কা হইতে মদীনা পর্যন্ত সকল গোত্রের মধ্যে এক দাবান্নি জুলিয়া উঠিল। সুতরাং হিজরী ৫ম সনের ১০ই মুহাররাম তারিখে অনুষ্ঠিত 'যাতুর-রেকা'-এর যুদ্ধটি ছিল এই ষড়যন্ত্রেরই পরিণতি। অতঃপর হিজরী ৫ম সালের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত দু'মাতুল্ জানদাল এই ধারারই আরেকটি ঘটনা। হিজরী ৫ম সনের শাবান মাসের দোসরা তারিখে সংঘটিত গাযওয়াহ্-এ-বনীল মুস্তালাকও ছিল এই সম্মিলিত ষড়যন্ত্রেরই নগ্ন প্রয়াস। এই ষড়যন্ত্রসমূহ দীর্ঘদিন ধরিয়া বিভিন্ন আকারে চরম পরিণতির দিকে আগাইয়া যাইতে লাগিল।

গাযওয়াহ্-এ-আহুযাব তথা পরিখায়ুদ্ধ :

অবশেষে হিজরী ৫ম সনের যিল-কা'দা মাসে তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং এই উদ্দেশ্যে ১০ হাজারের এক সশস্ত্র বাহিনী মুসলমানগণকে পৃথিবীর বুক হইতে চিরতরে উচ্ছেদ করিবার লক্ষ্যে মদীনার দিকে অগ্রসর হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সংবাদ অবহিত হইয়া সমস্ত সাহাবাকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) মত প্রকাশ করিলেন যে, পশ্চাদবর্তী ময়দানে যুদ্ধ করা সমীচীন হইবে না, বরং মদীনার যে দিক দিয়া শত্রুদের ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই দিকে পরিখা খনন করা হউক। সুতরাং নবী করীম (দঃ) তিন হাজার সাহাবাকে সঙ্গে লইয়া পরিখা খনন করিতে প্রস্তুত হইলেন। ৬ দিনের মধ্যেই ১০ হাত গভীর পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। পরিখা খননে স্বয়ং সাইয়্যাদুল-মুরসালীন (দঃ)-এরও এক বিরাট ভূমিকা ছিল। —মোগলতাজ্, পৃষ্ঠা ৫৬

পরিখা খনন করিতে গিয়া একদিন কঠিন প্রস্তর শিলাখণ্ড বাহির হইয়া আসে। ফলে, পরিখা খননের কাজ ব্যাহত হইয়া পড়ে। নবী করীম (দঃ) তাঁহার পবিত্র হস্তে কোদাল মারিয়া এক আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া গুড়াইয়া দিলেন। অনন্তর খন্দক প্রস্তুত হইয়া গেল।

এই দিকে কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মদীনা অব-রোধ করিয়া বসিল। মুসলমানগণ প্রায় পনের দিন পর্যন্ত মদীনায় অবরুদ্ধ রহিলেন।

এমনই সময়ে ইহুদীদের অবশিষ্ট গোত্র বনী-কুরায়যাও চুক্তি ভঙ্গ করিয়া কাফেরদের দলে মিশিয়া তাহাদের দল ভারী করে।

অবরোধের কারণে মদীনার জন-জীবনে চরম অস্থিরতা ছড়াইয়া পড়িল। খাদ্য-ঘাটতির কারণে সাহাবাগণকে একাদিক্রমে তিন দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে হইল। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া সাহাবাগণ নিজেদের পেট খুলিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখাইলেন যে, তাঁহাদের পেটের সাথে

পাথর ঝাঁধা রহিয়াছে। তখন ছয়র (৮৬)-ও স্নায় পবিত্র পেটখানা খুলিয়া দেখাই-লেন। সেখানেও দুইটি পাথর ঝাঁধা ছিল।

এইদিকে অবরোধকারীরা যখন পরিখা অতিক্রম করিতে সক্ষম হইল না তখন তাহারা বাহির হইতেই তীর এবং পাথর বর্ষণ শুরু করিয়া দিল। এইভাবে উভয় পক্ষ হইতে অবিরাম তীর বিনিময় চলিতে লাগিল। এই পর্যায়ে নবী করীম (৮৬)-এর চারি ওয়াজের নামায় ক্বাযা হইয়া গেল।

কাফেরদের উপর প্রবল বায়ু-প্রবাহ এবং

আল্লাহর সাহায্য :

অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই সহায়-সম্মলহীন জামা'আতের সাহায্য করিলেন এবং কাফের বাহিনীর উপরে এমন প্রবল বায়ু প্রবাহ চলাইয়া দিলেন যে, তাহাদের তাঁবুর খুঁটিসমূহ উপড়িয়া গেল আর চুলার উপর হইতে হাঁড়ি-পাতিলগুলি পর্যন্ত উন্টিয়া পড়িল। ইহা কাফের বাহিনীর বুদ্ধিকে বিকল করিয়া দিল। ইতিমধ্যে তাহাদের রসদও ফুরাইয়া আসিল। এইদিকে হযরত নাদিম ইবনে মাসু'দ রাযিআল্লাহু আনহু এমন এক কৌশল অবলম্বন করিলেন যার ফলে কাফের বাহিনীর মাধো বিভেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টি হইয়া গেল। মোদ্দাকথা, সকল কারণ-উপকরণ এমনভাবে সমবেত হইল যে, কাফেরদের পদম্বলনের উপক্রম হইলে ময়দান পরিষ্কার হইয়া গেল।

বিবিধ ঘটনা :

এই বৎসরই হজ্জ ফরয হয়। তবে ইহার দিন-তারিখ সম্পর্কে আরো কতিপয় মত রহিয়াছে। এই বৎসরের জামাদুলউলা মাসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান অর্থাৎ, হযরত রোকাইয়ার পুত্র পরলোক গমন করেন। শাওয়াল মাসের শেষের দিকে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার জননীর ইন্তিকাল হয়। যি-কাআদ মাসে হযরত যয়নাব-বিনতে জাহাশের সহিত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বৎসরই মদীনায় ভূমিকম্প ও চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। —মোগলতাঈ, পৃষ্ঠা ৫৫

ষষ্ঠ হিজরী

[হোদায়বিয়ার সন্ধি, বাইয়াতে রিদওয়ান, পৃথিবীর
রাজা-বাদশাহগণের প্রতি ইসলামের দাওয়াত]

হোদায়বিয়ার সন্ধি :

হিজরী ৬ষ্ঠ সালের যিল-কদ মাসে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমনের ইচ্ছা করিয়া ওমরার ইহ্রাম বাঁধিয়া নেন। ১৪ বা ১৫ শত সাহাবার এক বিরাট জামা'আতও তাঁহার সঙ্গী হইলেন।

—সীরাতে মোগলতাস্ত

হোদায়বিয়া মক্কা শরীফ হইতে এক মন্জিল দূরে অবস্থিত একটি কূপ এবং ইহারই নামানুসারে অত্র এলাকার গ্রামের নামও হোদায়বিয়া বলিয়া খ্যাত। নবী করীম (দঃ) তথায় পৌঁছিয়া যাত্রা-বিরতি করিলেন।

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেযা :

তথায় একটি শুষ্ক কূপ ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেযার ফলে ইহাতে এত বিপুল পানির উৎপত্তি হইল যে, উপস্থিত সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

এখানে পৌঁছিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রাঃ)-কে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন, যেন তিনি কুরাইশদেরকে অবহিত করিয়া দেন যে, হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইবার শুধু বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত এবং ওমরা পালন করার জন্যই তশরীফ আনয়ন করিয়াছেন—ইহাছাড়া তাঁহার অন্য কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই। হযরত উসমান (রাঃ) মক্কায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই কাফেররা তাঁহাকে আটকাইয়া ফেলিল। এইদিকে মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়াইয়া পড়িল যে, কাফেররা হযরত উসমানকে হত্যা করিয়াছে। হযরত (দঃ)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছার পর তিনি একটি বাবুল বৃক্ষের নীচে বসিয়া সাহাবাদের নিকট হইতে জেহাদের বাইআত গ্রহণ করিলেন। ইহার বর্ণনা পবিত্র কুরআনেও রহিয়াছে এবং ইহাকেই “বাইআতে-রিদওয়ান” বলা হয়।

পরে জানা গেল যে, সংবাদটি মিথ্যা বরং কুরাইশরা সন্ধির শর্তসমূহ ঠিক করার উদ্দেশ্যে সোহায়ল ইবনে আমরকে প্রেরণ করিল। নিম্নবর্ণিত শর্তে অঙ্গীকার-পত্র লিপিবদ্ধ হইল এবং দশ বৎসরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি অনুষ্ঠিত হইল।

- ১। মুসলমানগণ এইবার উমরা আদায় না করিয়াই ফিরিয়া যাইবেন।
- ২। আগামী বৎসর হজ্জ করিতে আসিয়া মাত্র তিন দিন অবস্থান করিয়া চলিয়া যাইবেন।
- ৩। অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া আসিতে পারিবেন না। তরবারী সঙ্গে থাকিলে তাহা কোষবদ্ধ থাকিবে।
- ৪। মক্কা হইতে কোন মুসলমানকে সঙ্গে নিয়া যাইতে পারিবেন না।
- ৫। পক্ষান্তরে কোন মুসলমান যদি মক্কায় থাকিয়া যাইতে চান, তাহা হইলে তাহাকে বাধা দিতে পারিবেন না।
- ৬। কোন লোক যদি মক্কা হইতে মদীনায চলিয়া যায়, তাহা হইলে নবী করীম (দঃ) তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দিবেন।
- ৭। আর মদীনা হইতে কেহ মক্কায চলিয়া আসিলে কুরাইশরা তাহাকে ফেরত পাঠাইবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সমস্ত শর্ত যদিও বাহ্যতঃ সম্পূর্ণভাবেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ছিল এবং প্রকাশ্যতঃ এই সন্ধি একান্তই পরাজয়সুলভ ছিল কিন্তু মহান আল্লাহ তা'আলা ইহাকে 'মহান বিজয়' নামে অভিহিত করেন এবং এই সফরেই সূরা "ফাতাহ" অবতীর্ণ হয়। সাহাবাগণ এইভাবে নতজানু হইয়া সন্ধি করাকে মোটেই মানিয়া নিতে পারিতেছিলেন না। হযরত ওমর (রাঃ) বার বার নবী করীম (দঃ)-কে এই সন্ধি মানিয়া না নিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু ছয়র (দঃ) বলিলেন, "ইহাই আমার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এবং ইহাতেই আমাদের ভবিষ্যত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে।" সুতরাং পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এই রহস্যের সমাধান করিয়া দেয়। যেমন এই সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত মক্কা এবং মদীনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হইয়া যায়। কাফেররা নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে এবং মুসলমানদের কাছে বিনা বাধায় আসা যাওয়া করিতে থাকে।

এইদিকে ইসলামী চরিত্রের আকর্ষণী শক্তি কাফেরদিগকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করিতে লাগিল। ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা অনুযায়ী ঐ সময় এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষিত হয় যে, ইতিপূর্বে আর কখনও এত বেশী লোক ইসলামে দীক্ষা লাভ করে নাই। প্রকৃত পক্ষে এই সন্ধি ছিল মক্কা বিজয়েরই ভূমিকা।

বিশ্বের শাসকবর্গের প্রতি

ইসলামের দাওয়াত :

এই সন্ধির ফলে রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়া গেলে ছয়র (দঃ) সতোর অবিনশ্বর বাণী দুনিয়ার সকল শাসকবর্গের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

সুতরাং এই উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-কে হাবশার বাদশাহ আস্হামা নাজ্জাশীর নিকট প্রেরণ করা হইল। তিনি নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র পত্রখানা তাঁহার উভয় চোখের উপর স্থাপন করিলেন এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া নীচে মাটির উপরে বসিয়া পড়িলেন আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নবী করীম (দঃ)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁহার ইস্তিকাল হইয়াছিল।

হযরত দাহইয়া ক্বালবীকে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করা হইল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য নবী তাহা তিনি অকাটা প্রমাণাদি আর অতীতের আস্মানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট জানিতে পারিয়া ছিলেন। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার উপর তাহার প্রজাকুল ক্ষেপিয়া গেল। তিনি ভীষণ ভয় পাইয়া গেলেন যে, যদি আমি মুসলমান হই, তাহা হইলে এই সমস্ত লোক আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে— এই জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণে বিরত রহিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হোযায়ফা (রাঃ)-কে পারস্য সম্রাট খস্রু পারভেজের নিকট পাঠানো হইল। এই হতভাগা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চিঠির সহিত অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করিল এবং ইহাকে ছিড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, “আল্লাহ যেন তাহার সাম্রাজ্যকে তদুপ টুকরা টুকরা করিয়া দেন যেমন সে আমার চিঠিখানাকে করিয়াছে।”

সাইয়্যাদুর-রসূল (দঃ)-এর দো'আ কিভাবে অপূর্ণ থাকিবে! কিছু দিন পরেই খস্রু পারভেজ স্বয়ং তাহার পুত্র শেরকভিয়ার হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

হযরত হাতিব ইবনে আব্বালতাআ (রাঃ)-কে মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের নিকট পাঠানো হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরেও আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও ইসলামের নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি হযরত হাতেবের সহিত বেশ সদ্ব্যবহার করেন এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু উপটোকন প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে একজন বাদী মারিয়া কিবতিয়া (রাঃ)-ও ছিলেন এবং দুলদুল নামক একটি সাদা খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, এক সহস্র দীনার এবং বিশ জোড়া জামা কাপড়ও উপটোকনের মধ্যে ছিল।

হযরত আমর ইবনুল আস্কে আশ্মানের বাদশাহগণ অর্থাৎ জাইফার ও আব্দুল্লাহ-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহারাও ব্যক্তিগত তদন্ত এবং অতীতের কিতাবাদির মাধ্যমে নবী করীম (দঃ)-এর নবুওয়তের সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী

হইয়া উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা তখন হইতেই প্রজাসাধারণের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিতে শুরু করিয়া দেন এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর হাতে সোপর্দ করেন। —সুরুরুল-মাহ্বুন

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) ও

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ :

হযরত খালেদ ইবনে অলীদ (রাঃ) তখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি জেহাদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আসিতেছিলেন। অধিকাংশ জেহাদে বিশেষ করিয়া উহুদ যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁহার কারণেই কাফেরদের স্বলিত পা দৃঢ় ও শক্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ, নির্ঘাৎ পরাজয়ের মুখেও তাহারা জয়লাভ করিয়াছিল। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে মদীনার পথে রওয়ানা হন। পথে আমর ইবনুল আস (রাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত হইল। জানা গেল তিনিও একই উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। উভয়ে একসঙ্গে মদীনা পৌঁছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধনা হইলেন। (اصابه للحافظ)

সপ্তম হিজরী

[গায়ওয়াহ-এ-খায়বার, ফাদাক বিজয়, উমরা-এ-কায়া]

খায়বারের যুদ্ধ :

মদীনার ইহুদীদের মধ্যে বনী-নাযীর যখন খায়বারে^১ গিয়া বসতি স্থাপন করে, ঠিক তখন হইতেই খায়বার যাবতীয় ইহুদী তৎপরতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাহারা আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিত। তাহাদের এই অশুভ তৎপরতা চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য হিজরী ৭ম সনের মুহাররম অথবা জামাদিউল-আউয়াল মাসে নবী করীম (দঃ) চারশত পদাতিক এবং দুইশত অশ্বারোহী বাহিনী লইয়া খায়বার অভিমুখে যাত্রা করেন। তুমুল সংঘর্ষ ও হতাহতের পর যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানগণকে বিজয় দান করেন এবং ইহুদীদের সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়।

এই যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) সর্বাধিক দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একাই খায়বারের কপাট উপড়াইয়া ফেলেন। অথচ ৭০ (সত্তর) জন লোকের পক্ষেও

টিকা

১০ মদীনা শরীফ হইতে সিরিয়ার দিকে তিন-চার মনযিল দূরে অবস্থিত একটি বড় শহর।

—যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭

সেটি নাড়া সম্ভব ছিল না। কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিন এই দরজাটি ঢাল পরগণা ব্যবহার করিয়াছিলেন। —যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৯

ফাদাক বিজয় :

খায়বার বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাদাকের ইহুদীদের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করিলেন। তাহারা চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল।

উমরা-এ-ক্বাযা :

হোদায়বিয়ার সন্ধির বৎসর যে উমরা ভাগ করা হইয়াছিল এবং কুরাইশদের সহিত এই চুক্তি হইয়াছিল যে, আগামী বৎসর উমরা পালন করিবেন এবং তিন দিনের বেশী অবস্থান করিবেন না, সেই চুক্তি মোতাবেক এই বৎসর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীগণসহ পুনরায় মক্কায় তশরীফ লইয়া গেলেন এবং চুক্তির শর্তসমূহের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রাখিয়া উমরা সমাপনান্তে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অষ্টম হিজরী

[সিরিয়া-এ-মু'তা ও মক্কা বিজয়]

মু'তার যুদ্ধ :

মু'তা^১ সিরিয়ার বালকা শহরের সন্নিকটে বায়তুল-মুকাদ্দাস হইতে প্রায় দুই মন্বিল দূরত্বে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। এইখানেই মুসলমান এবং রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইহার কারণ ছিল এই যে, রোম-সম্রাটের পক্ষে বসরার শাসন কর্তা আমর ইবনে শুরাহ্বীল নবী করীম (দঃ)-এর দূত হারেস ইবনে উমায়ের (রাঃ)-কে হত্যা করিয়াছিল। কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা ছিল একটি ক্ষমাহীন ও গর্হিত অপরাধ এবং সরাসরি যুদ্ধ-ঘোষণার শামিল। ইহার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (দঃ) অষ্টম হিজরীর মঝামাঝি তিন হাজার সাহাবার একটি বাহিনী প্রেরণ করিলেন। মুসলমানগণ মু'তার নিকট উপনীত হইলে রোমানরা দেড় লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইল। কয়েক দিন যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা দেড় লক্ষ কাফেরের উপর তিন সহস্র

টিকা

১০. মু'তা শব্দের মীমের উপরে পেশ, ওয়াও সাকিন **موتة** হামযা ব্যতীত এবং কাহারো কাহারো মতে ওয়াও-এর উপরে হামযা হইবে। —যুরকানী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৭

মুসলমানের ভীতি এমনভাবে সঞ্চারিত করিয়া দিলেন যে, পশ্চাদপসারণ ব্যতীত তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার অন্য কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইল না। — তালখীসুস-সীরাতে মক্কা বিজয়ঃ

হোদায়বিয়ার চুক্তিপত্রে যে সমস্ত শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, মুসলমানগণ তাহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাহা পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু হিজরী ৮ম সালে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করিল। নবী করীম (দঃ) একজন দূতের মাধ্যমে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে কতিপয় শর্ত উপস্থাপন করিলেন এবং শেষের দিকে লিখিয়া দিলেন যে, এই শর্তসমূহ তাহাদের মনঃপূত না হইলে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গের প্রস্তাবই পছন্দ করিল।

নবী করীম (দঃ) জেহাদের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করিলেন এবং হিজরী ৮ম সালের ১০ই রমযান মঙ্গলবার আসরের নামাযের পর ১০ হাজার^১ লোকের বিরাত বাহিনী লইয়া মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা ত্যাগ করিলেন। হুদাইবিয়া নামক স্থানে পৌঁছার পর মাগরিবের সময় হইলে সকলে রোযা ইফতার করিলেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-কে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশসহ (আপেক্ষাকৃত) উপরের দিক দিয়া মক্কায় প্রবেশ করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। এবং বলিয়া দিলেন যে, কেহ তোমাদের সহিত যুদ্ধ না বাধাইলে তোমরাও তাহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইও না।

এইদিকে নবী করীম (দঃ) স্বয়ং অপর প্রান্ত দিয়া মক্কায় প্রবেশ করিলেন এবং সাধারণ ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন যে, “যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে সে নিরাপদ এবং যে ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া রাখিবে সেও নিরাপদ।” অবশ্য ১১ জন পুরুষ আর ৪ জন নারীর রক্ত ক্ষমা করেন নাই। কারণ, ইহাদের অস্তিত্ব স্বয়ং যাবতীয় বিশৃঙ্খলার উৎস ছিল। কিন্তু ইহারা সকলেই ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িল এবং পরে তাহাদের অধিকাংশই মক্কা বিজয়ের পরে মীদনায় পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল।

২০শে রমযান শুক্রবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফ সম্পন্ন করিলেন। তখনও পর্যন্ত কা'বা শরীফের আশেপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি রক্ষিত ছিল। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হস্তে এক খণ্ড কা' ছিল। যখন তিনি কোন মূর্তির পাশ দিয়া যাইতেন, তখন উহা দ্বারা ইঙ্গিত

টিকা

১- হার্কীমের বর্ণনা মতে ১২ হাজার ছিল। — মোগলতাঙ্গ

করিতেন আর মূর্তিটি মুখ খুবড়াইয়া পড়িয়া যাইত। তিনি তখন এই আয়াতটি পাঠ করিতেছিলেন—

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাৎ, “সত্য আসিয়া গিয়াছে; বাতিল নির্মূল হইয়াছে। বাতিল তো নিশ্চিতই ক্ষয়িষ্ণু।”

মক্কা বিজয়ের পর কুরাইশদের সহিত

মুসলমানদের আচরণ :

তাওয়াফ সমাপ্ত করিয়া নবী করীম (দঃ) কা'বা শরীফের চাবিবাহক উসমান ইবনে তালহা শাহিবীর নিকট হইতে কা'বা গৃহের চাবি লইয়া কা'বা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে বাহির হইয়া মাকামে ইব্রাহীমের উপর নামায পড়িলেন। নামায শেষে তিনি মসজিদে তশরীফ নিয়া গেলেন। আজ তিনি কুরাইশদের সম্পর্কে কি নির্দেশ জারী করেন—লোকজন গভীর উৎকণ্ঠার সহিত তাহারই অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু সকল সন্দেহ ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটাইয়া সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব শাস্তির দূত মুহাম্মদ (দঃ) কুরাইশদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন : “তোমরা সকল দিক দিয়াই স্বাধীন ও নিরাপদ।” অনন্তর তিনি কা'বা শরীফের চাবিও তাহাদিগকে ফেরৎ দিয়া দিলেন। —তালখীসুস-সীরাত

নবী-করীম (দঃ)-এর মহত্ব এবং

আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ :

আবু সুফিয়ান যিনি তখনও পর্যন্ত নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে পরিচালিত কুরাইশদের প্রায় সব কয়টি যুদ্ধে তিনিই প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছিলেন, মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিম বাহিনীর সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মক্কা হইতে বাহির হইলে সাহাবাগণ তাহাকে গ্রেফতার করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যখন গ্রেফতার করিয়া রাহ্মাতুল-লিল-আলামীনের খেদমতে উপস্থিত করা হইল, তখন সেখান হইতে তাহাকে ক্ষমা করার নির্দেশ প্রদত্ত হইল। নবী করীম (দঃ)-এর এই মহত্ব ও উদারতার ফলশ্রুতিতে আবু সুফিয়ান সাথে সাথে মুসলমান হইয়া গেলেন। এখন আমরা তাঁহাকে “হযরত আবু সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আন্হু” বলিয়া থাকি।

মক্কা বিজয়ের দিন এক ব্যক্তি কাঁপিতে কাঁপিতে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইল। আপাদমস্তক করুণার ছবি নবী মুহাম্মদ (দঃ) বলিলেন, “শাস্ত হও

এবং নিশ্চিত থাক। আমি কোন রাজা-বাদশাহ নহি; বরং একজন অতি সাধারণ মায়ের সন্তান।”

মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই সময় মদীনার আনসারগণ এই কথা ভাবিয়া মনে কষ্ট পাইতে লাগিলেন যে, এখন তো হুযর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতেই থাকিয়া যাইবেন আর আমরা তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িব। কিন্তু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদের এই সন্দেহ আঁচ করিতে পারিয়া বলিলেন, “না, বরং এখন যে আমাদের মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরই সাথে জড়িত।” অতঃপর হযরত আব্তাব ইবনে উসাইদ (রাঃ)-কে মক্কার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি স্বয়ং পবিত্র মদীনা অভিমুখে ফিরিয়া চলিলেন।

হোনায়েনের যুদ্ধঃ

মক্কা বিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের জনগণ বিপুল সংখ্যায় ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন যাহারা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের প্রতিপত্তির ভয়ে ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত করিতেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহাদের সকলেই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অবশিষ্ট আরবদেরও এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তাহারা এখন ইসলামের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়।

অবশ্য হাওয়াযিন এবং বনী সাকীফ গোত্রদ্বয় আত্মসম্মানবোধের খাতিরে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করার সংকল্প লইয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হইল। রাসূলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ অবগত হইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে ১২ হাজার সেনার এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করিলেন। ইহাদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন ঐ সকল আনসার ও মুহাজের যাহারা মক্কা বিজয়ের সময় মদীনা হইতে নবী করীম (দঃ)-এর অনুগামী হইয়াছিলেন আর ২ হাজার ছিলেন ঐ সকল নঃ-মুসলিম, যাহারা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (এই সংখ্যাটি এখন পর্যন্ত ইসলামী বাহিনীর সবচাইতে বড় সংখ্যা ছিল।)

টিকা

১০ সীরাতে মোগলতঙ্গি। বোখারী শরীফের সপ্তম পৃষ্ঠার বর্ণনা অনুযায়ী এই ব্যাপারে আরো বিভিন্ন মত রহিয়াছে।

হিজরী ৮ম সালের ৬ই শাওয়াল আল্লাহর এই বাহিনী রওয়ানা হইল। যখন তাহারা হোনায়েন প্রান্তরে উপনীত হইলেন, তখন পাহাড়ের ঘাটিতে আত্ম-গোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতে মুসলমানদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। যেহেতু তখনও সৈন্যদের ব্যাহ বিন্যাসই সমাপ্ত হয় নাই, তাই মুসলিম-বাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটিতে লাগিল।

এই পশ্চাদপসরণের বাহ্যিক কারণ হিসাবে ব্যাহ বিন্যাসের অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করা হইলেও বাস্তব কারণ কিন্তু অন্যটি। সোঁদিকেই পবিত্র কুরআন ইঙ্গিত করিয়াছে। অর্থাৎ, “মুসলমানগণ এই সময় চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিকা আর সাজ-সরঞ্জাম প্রত্যক্ষ করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতে ছিলেন এবং কোন কোন সাহাবী এমনকি হযরত সিদ্দীকে আকবর রাযিআল্লাহু আনহুর মত লোকের মুখেও “আজ আমরা পরাজিত হইতে পারি না” এই উক্তি উচ্চারিত হইয়াছিল। এইজন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন, যেন তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতে এবং তাহা তীর ও তরবারীর খেলা মাত্র নহে। বরং—

این همه مستی و بیہوشی نہ حد بادہ بود
با حریفان آنچه کرد آن نرگس مستانه کرد

“নাগিসের সেই শক্তি কোথা
রঙ চড়াবে আমার প্রাণে?
আড়ালে তার যে জন আছে
সেই তো মোরে কাছে টানে।”

বদর যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয় আর হোনায়েনের যুদ্ধে এত বিপুল সাজ-সরঞ্জামের সমাবেশ সত্ত্বেও (প্রথম দিকে) পরাজয়ের ইহাই অন্তর্নিহিত রহস্য।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সময় দুইটি বর্ম পরিধান করিয়া দুলাদুল নামক একটি সাদা খচ্চরের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। লোকজনকে পশ্চাদপসরণ করিতে দেখিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে

টিকা

১০ হোনায়েন পবিত্র মক্কা হইতে তিন মনযিল দূরে তায়েফের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

—মোগলতস্বি, পৃষ্ঠা ৭২

হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমানগণকে এক বীরত্ববাজক আওয়াজ দ্বারা যুদ্ধরত থাকার আহ্বান জানান। ফলে, তাঁহাদের নড়বড়ে পা পুনরায় সুদৃঢ় হইয়া যায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই আরম্ভ হয়।

এক মহান মো'জেষা :

[এক মুষ্টি মৃত্তিকা দ্বারা বিরাট শত্রু বাহিনীর পরাজয়]

এইদিকে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি মাটি উঠাইয়া শত্রু বাহিনীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন যাহা মহান আল্লাহর কুদরতে প্রতিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের চোখে এমনভাবে গিয়া প্রবেশ করিল যে, একটি চক্ষুও রক্ষা পাইল না।

—সীরাতে মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ৭২

শেষ পর্যন্ত শত্রু-বাহিনী ভীত ও পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। মুসলিম বাহিনীর চারি ব্যক্তি আর কাফের বাহিনীর সত্তর জনেরও অধিক সৈন্য নিহত হইল। মুসলমানরা প্রতিশোধের নেশায় শিশু ও নারীদের উপর হাত উঠাইতে উদাত হইলে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে এ কাজ হইতে বিরত রাখিলেন। —মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ৭২

তায়েফ যুদ্ধ :

ইহার পর নবী করীম (দঃ) বনী-সাকীফ ও হাওয়াযিন গোত্রের কেন্দ্র তায়েফের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। প্রায় ১৮ দিন পর্যন্ত তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া রাখা হইল, কিন্তু বিজয় অর্জিত হইল না। সুতরাং তিনি যখন অবরোধ তুলিয়া দিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, তখন পথিমধ্যেই জি'রানা নামক স্থানে তায়েফ হইতে হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইল এবং হোনায়েন যুদ্ধে তাহাদের যে সকল লোক বন্দী হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবার আবেদন জানাইল। হযূর (দঃ) তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়া তাহাদের বন্দীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর নবী করীম (দঃ) মদীনায়া উপনীত হইলে তায়েফবাসীদের একটি প্রতিনিধি দল তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিল। —মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ৭৪

উমরা-এ-জি'রানা :

হোনায়েন যুদ্ধের পর জি'রানা নামক স্থানে অবস্থানকালে নবী করীম (দঃ) উমরা পালন করার ইচ্ছা করিলেন এবং এহরাম বাঁধিয়া মক্কায়া আগমন করিলেন। অতঃপর উমরা সমাপনাশ্বে সেই রাতেই জি'রানায় প্রত্যাবর্তন করিলেন।

—তালখীসুস্-সীরাতে, পৃষ্ঠা ৫৪

নবম হিজরী

[গায়ওয়াহ-এ-তবুক, হাজ্জুল ইসলাম, প্রতিনিধি
দলের আগমন এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ]

তবুক যুদ্ধ ও ইসলামে চাঁদার প্রচলনঃ

তায়ফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছয়র (দঃ) মদীনায়ই অবস্থান করেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ম্যু'তার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা মুসলমানদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে মদীনা হইতে ১৪ মন্খিল দূরে তবুক নামক স্থানে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জেহাদের প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দুর্ভিক্ষের দরুন মুসলমানগণ অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্যে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। তদুপরি গরমও পড়িয়াছিল অত্যধিক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আত্মত্যাগী সাহাবাগণ জেহাদের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগিলেন। জেহাদ-তহবিলে চাঁদা দানের আবেদন জানানো হইলে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) তাঁহার যাবতীয় মাল-সামান নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে আনিয়া হাযির করিলেন। হযরত উসমান (রাঃ) যুদ্ধোপকরণের মাধ্যমে এক বিরাট সাহায্য পেশ করিলেন। ৯০০ উট আর ১০০ ঘোড়া ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। —মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ৭৬

রজব মাসের বৃষ্পতিবার নবী করীম (দঃ) ত্রিশ হাজার সাহাবীর এক বিশাল বাহিনীসহ তবুকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

কতিপয় মো'জেযাঃ

ছয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) দল হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছেন। তখন নবী করীম (দঃ) বলিলেন, “এই লোকটি দুনিয়ার সকল সংশ্রব হইতে আলাদা হইয়াই চলিবে, আলাদাই যিন্দেগী অতিবাহিত করিবে এবং আলাদা অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করিবে।” বস্তুতঃ পরবর্তীতে তাহাই হইয়াছিল।

এই যুদ্ধেই নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী হারাইয়া যায়। ছয়র ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওহীযোগে অবহিত করা হইল যে, ইহার লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকাইয়া গিয়াছে। সেখানে গিয়া দেখা গেল, অবস্থা তদ্রূপই ছিল। —মোগলতাস্ত, পৃষ্ঠা ৭৭

মুসলমানগণ যখন তবুক পৌঁছিলেন, তখন সেখানে কেহই ছিল না। বাদশাহ হিরাক্লিয়াস হিমাস চলিয়া গিয়াছিল। হযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালেদ (রাঃ)-কে উকাইদির নামক খৃষ্টানের নিকট প্রেরণ করেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ বলেন, তোমরা রাত্রিবেলা এই অবস্থায় তাহার সাক্ষাত পাইবে যে, সে তখন শিকারে মগ্ন। হযরত খালেদ (রাঃ) সেখানে পৌঁছিয়া হুবহু তাহাই দেখিলেন। এবং তাহাকে বন্দী করিয়া নিয়া আসিলেন।

মোটকথা, নবী করীম (দঃ) প্রায় পনের-বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। কিন্তু কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইল না। অগত্যা তিনি ফিরিয়া আসিতে মনস্থ করিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার সর্বশেষ অভিযান। হিজরী নবম সালের রমযান মাসে নবী করীম (দঃ) পবিত্র মদীনায়া প্রত্যাবর্তন করেন।

মসজিদে যেরারে অগ্নি-সংযোগ :

তবুক হইতে ফিরিয়া আসার পর হযূর (দঃ) সেই জায়গাটিতে অগ্নি-সংযোগের নির্দেশ দিলেন যাহা মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করার উদ্দেশ্যে মসজিদের নামে তৈরী করিয়াছিল এবং মুসলমানদিগকে প্রতারণা করার লক্ষ্যে ইহার নাম দিয়াছিল মসজিদ। —মোগলতাস্তি

এই ঘটনার দ্বারা এই বিষয়টিও পরিষ্কার হইয়া গেল যে, মসজিদে যেরার বা যড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে নির্মিত মসজিদ বাস্তবপক্ষে মসজিদই নহে।

প্রতিনিধিদলের আগমন এবং

দলে দলে ইসলাম গ্রহণ :

হোদায়বিয়া সন্ধির পর যখন রাস্তাঘাট নিরাপদ হইয়া গেল, তখন ইসলামের প্রচার ও প্রসার (যাহার জন্য শান্তি ও নিরাপত্তারই প্রয়োজন ছিল সবচাইতে বেশী) অনেকাংশে ব্যাপক আকারে সংঘটিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এই জনাই সেই সন্ধির নাম আসমানী দফতরে “ফাতাহ” বা বিজয় রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পরেও কিছু লোক কুরাইশদের চাপে ইসলামে দীক্ষিত হইতে পারিতেছিল না। মক্কা বিজয় এই অসুবিধাটুকুও অপসারিত করিয়া দিল। এখন পবিত্র কুরআনের শাস্তত বাণী সমগ্র আরবের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া তাহার অনন্যসাধারণ প্রয়োগক্ষমতার মাধ্যমে সকলের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করিল। ফলে যে সকল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের চেহারা দর্শন করাকে কোনক্রমেই পসন্দ করিত না, তাহারাও দলে দলে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিধি দলের আকারে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং স্বেচ্ছায় ইসলামে দীক্ষিত হইয়া ইসলামের জন্য নিজের জান-মাল উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত

হইয়া যায়। এই প্রতিনিধি দলসমূহের অধিকাংশই হিজরী নবম সালে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়।

সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল :

তবুক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরেই সাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইহার পর ক্রমাগত প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয়—যাহার সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হইয়া থাকে।^১ তন্মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

বনী-ফায়ারার প্রতিনিধি দল :

এই গোত্রের লোকেরা পূর্বেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল। পরে প্রতিনিধি দল আকারে নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়।

বনী-তামীমের প্রতিনিধি দল :

বনী-তামীম গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সকলেই মুসলমান হইয়া দেশে ফিরিয়া যায়।

বনী-সাদ ইবনে বকরের প্রতিনিধি দল :

এই প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যেমাম ইবনে সা'লাবা। তিনি নবী করীম (দঃ)-কে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। হুযর (দঃ) ইহাদের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করায় তাঁহার মনের সকল সংশয় কাটিয়া যায়। অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করতঃ নিজ গোত্রের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলামের প্রচার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। পরে গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

কিন্দার প্রতিনিধি দল :

সূরা "সাফফাত"-এর প্রারম্ভিক কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করিবার সাথে সাথেই ইহারা মুসলমান হইয়া যান।

বনী-আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল :

ইহারা পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন। ইহাদের সকলেই নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে নবী করীম (দঃ) তাঁহাদিগকে ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি শিক্ষা দেন।

বনী-হানীফার প্রতিনিধি দল ॥

ইহারাও নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে মুসায়লামাও ছিল। যে পরে মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়া মিথ্যাবাদী

টিকা

১. হাফেজ মোগলতঙ্গি ইহাদের নাম বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। —সীরাতে মোগলতঙ্গি, পৃষ্ঠা ৭৭

মুসায়লামা নামে অভিহিত হয়। পরে নবুওয়তের এই মিথ্যা দাবীর কারণেই হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে সাহাবাদের হাতে সদলবলে নিহত হয়।

টিকা : মিথ্যাবাদী মুসায়লামা তাহার নবুওয়তের মিথ্যা দাবীর সময়ও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআনে মজীদ এবং ইসলামের প্রতি অবিশ্বাসী ছিল না।^১ সুতরাং হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম শায়খ আবু জা'ফর তাবারী তাহার ইতিহাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মুসায়লামা তাহার মুয়াজ্জিনকে আযানের মধ্যে সর্বদা **أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رُسُولُ اللَّهِ** —এই বাক্যটি উচ্চারণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কোন প্রকার নবুওয়তের দাবী কল্পনাকালেও বৈধ নহে; বরং সাধারণভাবে নবুওয়তের দাবী করা কোরআনের অসংখ্য আয়াত, “আহাদীসে মুতাওয়াতেরা” এবং “ইজমা-এ-উম্মতের” আকীদা মোতাবেক খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করারই নামান্তর। তাই ইজমা-এ-সাহাবার সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী মুসায়লামার শরীয়ত বিরোধী নবুওয়তের দাবী করাও ধর্নাদ্রোহিতা এবং স্ব-ধর্মতাগ বলিয়া সাব্যস্ত করা হয়। সুতরাং ইজমা-এ-সাহাবার রায় মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা হয়। তাহার আযান, নামায ও তেলাওয়াতে কুরআন তাহাকে কাফের বলা হইতে সাহাবাগণকে বিরত রাখিতে পারে নাই।

মীর্থা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর দাবী মিথ্যাবাদী মুসায়লামার চাইতেও অনেক বেশী। সে যে শুধু নিজেকে সমস্ত আম্বিয়া কেয়াম হইতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম বলিয়াই দাবী করে তাহা নহে, বরং কোন কোন নবী সম্পর্কে এমন মর্মান্তিক ও অপমানজনক মন্তব্য করিয়া থাকে যে, কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই তাহা সম্ভব নহে। বিশেষ করিয়া হযরত ঈসা আলাইহিসসালামের উপর সে তাহার অপবাদের তৃণ শূন্য করিয়া দিয়াছে। সে তাহাকে এমন অকথা ভাষায় গালাগাল দিয়াছে যে, তাহা শ্রবণ করিয়া কোন মুসলমানই সহ্য করিতে পারে না। যাহার সত্যতা খোদ মীর্থা সাহেবের রচিত গ্রন্থ “যমীমা-এ-আনজামে আথম” “দাফে উল বালা”, “নুযুলুল-মাসীহ” পুস্তক পাঠে সকলেই যাঁচাই করিতে পারেন। ইহা এবং এই ধরনের আরও অসংখ্য শেরেকী দাবী প্রত্যক্ষ করিয়া সকল ইসলামী দল ও মতের উলামাগণ যদি সর্বসম্মতভাবে তাহাকে কাফের বলিয়া ফতোয়া প্রদান করেন এবং তাহার নামায,

টিকা

১০ এবং নিজেকে স্বতন্ত্র শরীয়তধারী নবী বলিয়াও দাবী করিত না। বরং আমাদের যামানার কাদিয়ানী মীর্থা সাহেবের মত কোন নূতন শরীয়তের দাবী ছাড়াই নবী করীম (দঃ)-এর অধীনে নবুওয়তের দাবী করিত।

রোযা ও তাহার স্ব-কপোল কল্পিত ইসলাম প্রচারের প্রতি কোন প্রকার প্রত্যাশা না করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে ইহা হইবে সাহাবীগণের স্মরণেরই সঠিক অনুসরণ। ইহাতে তাঁহাদিগকে দোষারোপ করা যাইবে না।

বনী-কাহ্তানের প্রতিনিধি দল :

এই গোত্রের সরদার ছিলেন হযরত যায়েদ আল-খাইল। ইহারাও সকলেই নবী করীম (দঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বনী-হারিসের প্রতিনিধি দল :

ইহাদের মধ্যে হযরত খালিদ ইবনে অলীদ (রাঃ)-ও ছিলেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীসার্থীগণসহ মুসলমান হইয়া যান।

এইভাবে বনী আসাদ, বনী মুহারিব, হামাদান, গাসসান প্রভৃতি গোত্রের প্রতিনিধি দলের কেহ কেহ উপস্থিতির পূর্বে আবার কেহ কেহ উপস্থিতির পরে মুসলমান হন। হিমযারের বিভিন্ন সরদার—যাহারা নিজ নিজ গোত্রের বাদশাহ বলিয়া বিবেচিত হইতেন—তাহাদের পক্ষে দূতগণ সংবাদ নিয়া আসেন যে, তাহারা সকলেই স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া গিয়াছেন। এইভাবে পদাতিক ও অশ্বারোহী প্রতিনিধি দলসমূহ উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন। এইভাবে দশম হিজরী সালে বিদায় হজ্জের সময় নবী করীম (দঃ)-এর সঙ্গে এক লাখেরও বেশী মুসলমান শরীক হন। যাহারা এই হজ্জ উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সংখ্যা ইহার চাইতেও কয়েক গুণ বেশী ছিল।

সিন্দীকে আকবর (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনয়ন :

তব্বকের যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া হিজরী নবম সালের যি-কাআদা মাসে নবী করীম (দঃ) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে আমীরে হজ্জ মনোনীত করিয়া পবিত্র মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন।

দশম হিজরী

হজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায় হজ্জ :

হিজরী ১০ম সনের যি-কাআদা মাসের ২৫ তারিখ সোমবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াযযামা অভিমুখে যাত্রা করেন। সাহাবাদের এক বিরাট দলও তাঁহার সঙ্গী হইলেন, যাহাদের সংখ্যা এক লক্ষের চাইতেও বেশী ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে “যুল-হেলায়ফা” নামক স্থানে পৌঁছিয়া ইহরাম বাঁধেন। অতঃপর ৪ঠা যিল-হাজ্জ

রোজ শনিবার মক্কা মোয়াযযামায় প্রবেশ করেন এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হজ্জ আদায় করেন।

আরাফাতের খুতবা বা বিদায়-হজ্জের ভাষণ :

যিল-হাজ্জ মাসের ৯ তারিখে আরাফাতের ময়দানে গমন করিয়া নবী করীম (দঃ) এক বিস্তারিত ও অলংকারপূর্ণ ভাষণ দান করেন। ইহা ছিল হিতোপদেশ ও বিধিবিধান সম্বলিত মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশেষ নবীর সর্বশেষ পয়গাম। বিশেষ করিয়া ইহার নিম্ন-বর্ণিত বাণীসমূহ প্রতিটি মুসলমানকে তাহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত করিয়া রাখা উচিত :

“হে লোকসকল! আমার কথা শ্রবণ কর, যাহাতে আমি তোমাদের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় বিবৃত করিতে পারি। আগামী বৎসর পুনরায় তোমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব কি না তাহা আমার জানা নাই।”

অতঃপর বলিলেন, “তোমাদের নিকট কেয়ামতের দিন পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু ঠিক তেমনিভাবে সম্মানিত যেমনিভাবে আজিকার (আরাফার) এই দিন, এই (যিল হজ্জ) মাস এবং এই (মক্কা) নগরী তোমাদের কাছে সম্মানিত। এইজন্য কাহারও কাছে কাহারও কোন আমানত থাকিলে তাহা অবশ্যই আদায় করিয়া দিবে।”

অতঃপর বলিলেন, “হে লোকসকল! তোমাদের উপর তোমাদের স্ত্রীগণের কিছু অধিকার রহিয়াছে। তাহাদের উপরও তোমাদের কিছু অধিকার আছে। সবলোকই পরস্পর ভাই ভাই। কাহারও জনা তাহার ভাইয়ের মাল তাহার অনুমোদন ছাড়া হালাল হইবে না। আমার পরে তোমরা কাফের হইয়া যাইও না এবং একে অন্যকে হত্যা করিও না। আমি তোমাদের জন্য আমার পরে আল্লাহ্র কিতাব রাখিয়া যাইতেছি। যদি তোমরা ইহার নির্দেশাবলী শক্তভাবে ঠাকড়াইয়া ধর তাহা হইলে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না।”

অতঃপর বলিলেন, “হে লোকসকল! তোমাদের পালনকর্তা (রব্ব) এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলে এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হইতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত যে সর্বাপেক্ষা অধিক খোদা-ভীরু। কোন আরব কোন অনারবের উপর খোদা-ভীরুতা ব্যতীত অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী হইতে পারে না। মনে রাখিও, আমি আল্লাহ্র বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছি। ইয়া-আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী রহিয়াছ যে, আমি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি। উপস্থিত লোকদের উচিত, তাহারা যেন অনুপস্থিতদের নিকট এই সমস্ত বাণী পৌঁছাইয়া দেয়।”

হজ্জ সমাপন করিয়া নবী করীম (দঃ) ১০ দিন মক্কা মুয়াযযামায় অবস্থান করেন। তারপর পবিত্র মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

একাদশ হিজরী

[সারিয়াহ-এ-উসামা, অন্তিম পীড়া ও ওফাত]

সারিয়াহ-এ-উসামা :

মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী একাদশ সনের ২৬শে সফর সোমবার রোমানদের সহিত জিহাদের উদ্দেশ্যে এক অভিযান প্রস্তুত করেন। এই অভিযানে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ), হযরত ফারাকে আযম (রাঃ), এবং হযরত আবু উবায়দা (রাঃ)-এর ন্যায় প্রবীণ সাহাবাগণও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব হযরত উসামা (রাঃ)-এর উপর অর্পিত হয়। ইহাই ছিল সর্বশেষ অভিযান যাহা প্রেরণের সকল ব্যবস্থা নবী করীম (দঃ) নিজে সম্পন্ন করেন। ইহা রওয়ানা হইবার পূর্ব-মুহূর্তে নবী করীম (দঃ) জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়েন।

নবী করীম (দঃ)-এর অন্তিম পীড়া :

হিজরী একাদশ সনের সফর মাসের ২৮ তারিখ বুধবার দিবাগত রাত্রে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “বাকী গারকাদ” নামক গোরস্থানে গমন করিয়া কবরবাসীগণের উদ্দেশ্যে মাগফেরাতের দো‘আ করেন যে, “হে কবর-বাসীগণ! তোমাদের বর্তমান অবস্থা ও কবরের অবস্থান শুভ হউক। কেননা এখন পৃথিবীতে ফেতনার তমসা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।” সেখান হইতে ফিরিয়া আসার পর মাথায় ব্যথা অনুভব করিলেন এবং সাথে সাথে জ্বরও আসিয়া গেল।^১ সহীহ বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী এই জ্বর ক্রমাগত ১৩ দিন স্থায়ী হয়। এই রোগেই তাঁহার ওফাত হয়।^২ এই সময় তিনি তাঁহার অভ্যাস মোতাবেক প্রত্যহ পবিত্র সহ-ধর্মিণীগণের প্রকোষ্ঠে স্থানান্তরিত হইতে থাকেন। অসুখ দীর্ঘ এবং কঠিন আকার ধারণ করিলে অসুস্থতার দিনগুলিতে হযরত আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহার গৃহে অবস্থান করার জন্য অন্যান্য সহ-ধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চাহিলে সকলেই অনুমতি দিয়া দিলেন।

টিকা

১০ সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২২

২০ ফতহুল বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃষ্ঠা ৯৮

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-এর ইমামত :

ধীরে ধীরে পীড়া এত প্রবল আকার ধারণ করিল যে, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর মসজিদে তশরীফ নিয়া যাইতে পারিতেছিলেন না। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ)-কে নামাযে ইমামত করিবার নির্দেশ দিলেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামায পড়ান। এই সময় একদিন ঘটনাক্রমে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) আনসারদের একটি মজলিসের পাশ দিয়া যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন, তাঁহারা ক্রন্দন করিতেছেন। ক্রন্দনের কারণ জানিতে চাহিলে তাঁহারা বলিলেন, “হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি।” হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই সংবাদটি অবহিত করিলেন। ইহা শুনিয়া নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফযল (রাঃ)-এর কাঁধে ভর দিয়া বাহিরে আগমন করিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁহার আগে আগে ছিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বরে আরোহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু দুর্বলতা হেতু নীচের সিঁড়িতেই বসিয়া পড়িলেন; উপরে উঠিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি এক সালংকার ভাষণ দান করিলেন। ইহার কিছু অংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

শেষ নবীর শেষ ভাষণ :

“হে লোকসকল! আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে আশঙ্কা করিতেছ। আমার পূর্বে কি কোন নবী চিরদিন ছিলেন যে, আমিও থাকিব? হাঁ, আমি আমার পরওয়ারদেগারের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছি এবং তোমরাও আমার সহিত মিলিত হইবে। তোমাদের মিলনের স্থান হইতেছে “হাউয-এ-কাওসার”। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেহ পরকালে হাউয-এ-কাওসার হইতে পরিতৃপ্ত হইয়া পান করিবার বাসনা রাখিবে, সে যেন তাহার হাত এবং মুখকে অপ্রয়োজনীয় কাজ ও কথাবার্তা হইতে বিরত রাখে। আমি তোমাদিগকে মুহাজেরীনদের সহিত সদ্‌বহারের অসিয়ত করিতেছি।” অতঃপর আরো বলিলেন, “যখন লোকেরা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে, তখন তাহাদের শাসক এবং বাদশাহগণ তাহাদের সহিত ন্যায়ানুগ ব্যবহার করে। আর যখন তাহারা তাহাদের পালনকর্তার অবাধ্যতা করে, তখন তাহাদের শাসকগণও তাহাদের সহিত নিষ্ঠুর আচরণ শুরু করিয়া দেয়।”^১

টিকা

১০. দুকসুস-সীরাতিল্ হাম্দিয়া

ইহার পর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং ওফাতের পাঁচ অথবা তিনদিন পূর্বে আরো একবার বাহিরে আগমন করিলেন। তখন তাঁহার পবিত্র মস্তকে পট্টি বাঁধা ছিল। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নামায পড়াইতেছিলেন।^১ (নবীজীর আগমন টের পাইয়া) তিনি পিছনে সরিয়া আসিতে লাগিলেন। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে হাতের ইশারায় বারণ করিলেন এবং নিজে তাঁহার বাম পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।^২ নামাযের পর এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলিলেন, “আমার প্রতি আবুবকরের দান সবচাইতে বেশী। আমি যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও “খলীল” বা অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাইতাম, তাহা হইলে আবুবকরকেই বানাইতাম। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা’আলা ব্যতীত আর কেহ “খলীল” হইতে পারে না—সেইহেতু আবুবকর আমার দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু।” তিনি আরো বলিলেন, “আবুবকরের দরজা ছাড়া মসজিদে নববীতে অপর লোকদের জন্য যত দরজা রহিয়াছে তাহার সব কয়টি বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।” —ফত্বুলবারী, পারা ১২, পৃষ্ঠা ২৫৬

মুহাদ্দিস ইবনে হাক্কান এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর হযরত আবুবকর (রাঃ)-ই যে ইসলামী-দুনিয়ার খলীফা—আলোচ্য হাদীসে ইহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

—ফত্বুল বারী, পারা ১৪, পৃষ্ঠা ৩৫৬

ইহার পর ২রা^৩ রবিউল আউয়াল সোমবার যখন লোকেরা হযরত আবুবকরের নেতৃত্বে ফজরের নামায পড়িতেছিলেন, তখন হঠাৎ নবী করীম (দঃ) হযরত

টিকা

১০. বিশুদ্ধ মত এই যে, ইহা যোহরের নামায ছিল। —ফত্বুল বারী হিন্দী, পারা ১৮, পৃষ্ঠা ১০৬

২০. বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী এই সময় নবী করীম (দঃ)-ই ইমাম ছিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) এবং সমস্ত জামাত হযর (দঃ)-এর মুক্তদী ছিলেন। অবশ্য সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) উচ্চস্বরে তকবীর উচ্চারণ করিতেছিলেন। (মিশকাত-বাবে মুতাবাতুল ইমাম)

৩০. প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ১২ই রবিউল আউয়ালই ছিল নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের তারিখ। অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ এই তারিখই লিখিয়া আসিতেছেন। কিন্তু হিসাব অনুযায়ী কিছুতেই এই তারিখ হইতে পারে না। কারণ, এই কথা সর্বজন স্বীকৃত ও নিশ্চিত যে ওফাতের দিনটি ছিল সোমবার। আর একথাও নিশ্চিত যে, নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ হজ্জ হিজরী দশম সালের ৯ই জিলহাজ্জ জুমার দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি বিষয়ের পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবারে পড়ে না। সুতরাং হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) ছহীহ বোখারী শরীফের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত আলোচনার পর ইহাই সঠিক বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ওফাতের সঠিক তারিখ ২রা রবিউল আউয়ালই বটে। লিখনীর ভুলে ২-এর স্থলে ১২ হইয়া গিয়া থাকিবে এবং -

আয়েশার প্রকোষ্ঠের পর্দা উঠাইয়া লোকদের প্রতি লক্ষ্য করিলেন এবং মৃদুহাসা করিলেন। সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) ইহা লক্ষ্য করিয়া পিছনে সরিয়া আসিতে লাগিলেন এবং আনন্দের আতিশয্যে সাহাবাগণের মনও নামাযের মধ্যেই এলোমেলো হইয়া যাইতে লাগিল।

در نمازم خم ابروی توجوه یاد آمد

حالتی رفت که محراب بفریاد آمد

“নামাযের মাঝে চেহারা তোমার

যখনই আমার হয় গো স্মরণ!

মিহ্রাব তখন এগিয়ে এসে

মোর সনে করে কথোপকথন।”

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে হাতের ইঙ্গিতে নামায পূর্ণ করার আদেশ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং পর্দা নামাইয়া দিলেন। ইহার পর আর কখনও তিনি বাহিরে আগমন করেন নাই। এইদিনই যোহরের পর নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া রফীক-ই-আ'লার (পরম বন্ধুর) সান্নিধ্যে চলিয়া গেলেন। **وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ**। বোখারী শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী তখন নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ছিল ৬৩ বৎসর।

নবী করীম (দঃ)-এর সর্বশেষ বাক্যসমূহঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, এই অসুস্থতার দিনগুলিতে নবী করীম (দঃ) কখনও কখনও পবিত্র চেহারার উপর হইতে চাদর সরাইয়া দিয়া বলিতেন, ইহুদী ও খৃষ্টানদের উপরে আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ এই কারণেই বর্ষিত হয় যে, তাহারা নিজেদের নবীগণের কবরগুলিকে সেজদার স্থানে পরিণত করিয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল যেন মুসলমানগণ এই ধরনের বিষয় হইতে বাঁচিয়া থাকে।

—বোখারী, পৃষ্ঠা ১০৫

আফসোস! রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবন সায়াহুে যে কাজ হইতে ভীতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সেই পাপটিও আজ মুসলমানরা করিতে

- আরবী বাক্য **ثانى عشر ربيع الاول** এর পরিবর্তে **ثانى شهر ربيع الاول** হইয়া গিয়াছে।
 والله اعلم
 হাফেজ মোগলতাস্টিও ২রা তারিখকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন।

ছাড়ে নাই এবং ওলী ও নেককার লোকদের কবরসমূহকে সেজদার জায়গায় পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। (নাউযু বিল্লাহে মিনহু)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরো বলেন, ওফাতের ঠিক পূর্বমুহূর্তে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাদের দিকে তাকাইতেন এবং বলিতেন, اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى অর্থাৎ ইয়া আল্লাহ্! আমি “রফীকে আ'লা” তথা সর্বোচ্চ বন্ধুকেই পছন্দ করি।

কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নবী করীম (দঃ)-এর যবান মোবারকে الصَّلُوةُ الصَّلُوةُ অর্থাৎ “নামায” “নামায”—এই কথা কয়টি উচ্চারিত ছিল এবং যতক্ষণ শব্দ শোনা যাইতেছিল এই কথা কয়টিই উচ্চারিত হইতেছিল।

—খাসাইসে কুবরা

ওফাতের সংবাদ সাহাবাগণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ার সাথে সাথে তাঁহারা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। হযরত ফারুকে আযমের মত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোকাতিশয্যে তাঁহার মৃত্যুকেই অস্বীকার করিতে লাগিলেন। এই সময় হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) আগমন করিলেন এবং লোকজনকে ধৈর্য ধারণ করার আহ্বান জানাইয়া একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দান করিলেন। ভাষণের শেষের দিকে বলিলেন, “যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূজা করিত সে শুনিয়া রাখুক যে, তাঁহার ওফাত হইয়া গিয়াছে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করিত সে জানিয়া রাখুক যে, তিনি অমর এবং চিরঞ্জীব।” ইহা শ্রবণ করিবার পর সাহাবাদের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। অতঃপর যেহেতু হযুরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর খলীফা নির্বাচন করাই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সেইহেতু সাহাবাগণ তাঁহার দাফন কাফনের পূর্বেই খলীফা নির্বাচন করাকে অত্যন্ত যত্নসহ বিবেচনা করিলেন। কেননা সর্ববিধ দ্বীন ও পার্থিব কাজকর্মের অসুবিধা, ভিতরের এবং বাহিরের শত্রুদের আক্রমণাশঙ্কা প্রভৃতি ছাড়াও নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফনের ব্যাপারেও মত-বিরোধ দেখা দেওয়ার প্রবল আশঙ্কা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হইতে খানিকটা সময় লাগিয়াছিল

টিকা

১০ ইমাম বায়হাকী হযরত আয়েশা সিদ্দীকার রেওয়ায়ত উল্লেখপূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন যে, ওফাতের পূর্ব-মুহূর্তে নবী করীম (দঃ)-এর যবান মোবারক হইতে أَيُّمَانُكُمْ وَصَلَاتُكُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ লোকের হক সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখিবে।

এবং এই কারণেই সোমবার বিকাল হইতে বুধবার রাত পর্যন্ত নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফন কাফন স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল। বুধবার রাতে হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাগণ তাঁহাকে গোসল করাইয়া কাফন পরাইলেন এবং তাঁহার জানাযার নামায পড়া হইল। বিশুদ্ধ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর ঘরের সেই স্থানটিতে কবর মোবারক খনন করা হইল ঠিক যেই স্থানটিতে তিনি ওফাত পাইয়াছিলেন। হযরত আবু তালহা কবর খনন করিলেন এবং হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ) প্রমুখগণ তাঁহাকে কবরে শোয়াইলেন। নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর অর্ধ হাত উঁচু রাখা হয়।

নবী করীম (দঃ)-এর পবিত্র জীবন-চরিত সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর তাঁহার উত্তম চরিত্রের কিছু বিষয় সংক্ষেপে পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরা উচিত ও সমীচীন বলিয়া মনে হইতেছে।^১ আল্লাহ পাক হয়তো তাহা অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাওফীক আমাদিগকে দান করিবেন। আর ইহা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা হইতে মোটেও দূরে নহে।

নবী করীম (দঃ)-এর

মহান চরিত্র ও মো'জেযা :

নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব চাইতে বেশী সাহসী বীরত্বের অধিকারী এবং সর্বাধিক দানশীল ছিলেন। যখনই কেহ তাঁহার নিকট কোন কিছু চাহিত তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাহা দান করিয়া দিতেন। তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুগম্ভীর ও ব্যক্তিত্বশীল ছিলেন। এমন কি সাহাবাগণ যখন তাঁহাকে কাফেরদের একটি গোত্রের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করিবার জন্য আবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন— “আমি রহমত হইয়া আসিয়াছি, অভিশাপ হইয়া নয়।” তাঁহার পবিত্র দান্দান মোবারক শহীদ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তখনও তাহাদের জন্য মাগ্ফেরাতের দো'আই করিতেছিলেন।

তিনি সর্বাধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি কাহারও উপরে স্থির থাকিত না। নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কাহারও নিকট হইতে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করিতেন না। এবং রাগও করিতেন না। তবে আল্লাহর বিধানের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইলে রাগ করিতেন। আর যখন তিনি রাগান্বিত হইতেন, তখন কেহই তাঁহার সামনে

টিকা

১০ এই সমস্ত বর্ণনা ‘সীরাতে মোগলতাস্ত’-এর তরজমা। ইহার বিশদ বর্ণনা আমি اداب النبى গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

দাঁড়াইবার সাহস পাইত না। যখনই তাঁহাকে কোন দুইটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তিনি সব সময় সহজটিকেই বাছিয়া নিয়াছেন। (যেন উন্মত্তের জন্য সহজতর হয়।)

তিনি কখনও কোন খাবার জিনিসের খুঁত বাহির করেন নাই। তবে তাহা পসন্দ হইলে আহার করিতেন, অন্যথায় পরিত্যাগ করিতেন। তিনি হেলান দিয়া বসিয়া আহার করিতেন না। তাঁহার জন্য কখনও পাতলা চাপাতি রুটি তৈরী করা হইত না। শশা এবং তরমুজ খেজুরের সাথে মিলাইয়া খাইতেন। মধু এবং সকল প্রকার মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য স্বভাবতঃই পছন্দ করিতেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অবস্থায়, দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাঁহার পরিবার পরিজনদের কেহই পেট ভরিয়া যবের রুটিও ভক্ষণ করেন নাই। তাঁহার পরিবারের একাধারে দুই দুই মাস পরিষ্কার এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, চুলায় আগুন জ্বলাইবার পর্যন্ত ব্যবস্থা হইত না; শুধু খোরমা আর পানি খাইয়া কাটাইয়া দিতেন।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জুতা নিজেই সেলাই করিতেন এবং কাপড়ে নিজেই তালি লাগাইয়া নিতেন। পরিবারের যাবতীয় কাজ-কর্মে সহযোগিতা করিতেন। রোগীর সেবা করিতেন। কেহ তাঁহাকে দাওয়াত করিলে সে ধনী হোক কি গরীব হোক তাহার বাড়ীতে চলিয়া যাইতেন। কোন দরিদ্রকে তাহার দারিদ্র্যের কারণে হয় মনে করিতেন না এবং কোন বড় হইতে বড় রাজা বাদশাহকেও তাহার বাদশাহীর কারণে ভয় পাইতেন না। সওয়ারীর পিছনে নিজের গোলাম প্রভৃতিকে বসাইয়া লইতেন। মোটা কাপড় পরিধান করিতেন এবং সেলাই করা জুতা পায়ে দিতেন। সাদা কাপড় সবচাইতে বেশী পসন্দ করিতেন। অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকর করিতেন এবং অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা হইতে বিরত থাকিতেন। নামায দীর্ঘ আর খোৎবা সংক্ষিপ্ত করিতেন। গোলাম আর দরিদ্রদের সহিত চলাফেরায় লজ্জাবোধ করিতেন না। সুগন্ধি পছন্দ করিতেন এবং দুর্গন্ধকে ঘৃণা করিতেন। গুণীর সমাদর করিতেন এবং কাহারও সহিত রক্ষস্বরে কথা বলিতেন না। কাহাকেও মুবাহ খেলাধুলা করিতে দেখিলে তাহা হইতে নিষেধ করিতেন না। কখনও কখনও হাসি-তামাশা ও মনোরঞ্জনের কথা বলিতেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বাস্তবতার বাহিরে কিছু বলিতেন না। সমস্ত মানবকুলের মধ্যে তিনি অত্যন্ত হাসিমুখ ও উত্তম চরিত্রবান ছিলেন। কেহ অপারগতা প্রকাশ করিলে তাহা মানিয়া লইতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, “নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল পবিত্র কুরআন।” অর্থাৎ, কুরআন যাহা পসন্দ

করিত তিনিও তাহা পসন্দ করিতেন আর কুরআন যাহা অপসন্দ করিত তিনিও তাহা অপছন্দ করিতেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশবো-এর চাইতে উত্তম খুশবো কখনও শুনিকি নাই।

নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেয়াসমূহঃ

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহগণ যখন কাহাকেও কোন প্রদেশের শাসনকর্তা করিয়া পাঠান, তখন তাহার সঙ্গে এমনকিছু নিদর্শন দিয়াদেন যাহা দেখিয়া জনগণ তাঁহার শাসক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইতে পারে। যেমনঃ কিছু দাস-দাসী, সৈন্য-সামন্ত ও এমন কিছু ক্ষমতা যাহা সাধারণ কোন মানুষ কার্যকর করিতে পারে না। এমনভাবে যখন আল্লাহর নবী-রাসুলগণ পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে সততা, দীন-দারী, চরিত্র-মাধুর্য এবং সর্বপ্রকার মানবিক গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতার নিদর্শনসমূহ ছাড়াও একটি আলৌকিক শক্তিও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। যদ্বারা বিরুদ্ধ-বাদীদের মস্তক অবনত হইয়া যায়। এই সকল অলৌকিক শক্তি আর অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রকৃতির উর্ধ্বের ক্ষমতাসমূহকে মো'জেয়া বলা হইয়া থাকে।

আমাদের নবী করীম (দঃ)-এর মো'জেয়াসমূহ সংখ্যা এবং বৈশিষ্ট্যের বিচারেও পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেয়াসমূহের চাইতে উত্তম ও বেশী।

পূর্ববর্তী নবীগণের মো'জেয়াসমূহ তাঁহাদের জীবনকাল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মো'জেয়া “পবিত্র কুরআন” আজও প্রত্যেক মুসলমানের হাতে রহিয়াছে। যাহার সমকক্ষতা করিতে দুনিয়ার সকল শক্তি এবং মানব-দানব সকলেই অক্ষম হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা, অঙ্গুলীর ঈশারায় পানি প্রবাহিত হওয়া, কংকরের তসবীহ পাঠ, কাষ্ঠ স্তম্ভের ক্রন্দন করা, বৃক্ষের নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করা, বৃক্ষদের ডাকা এবং তাহাদের চলিয়া আসা, হাজার হাজার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের সূর্যের মত সত্য হইয়া প্রকাশিত হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য মো'জেয়া—যাহা শুধু যে কুরআনের আয়াত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা বর্ণিত তাহাই নহে; বরং বহু কাফেরের সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত। এইগুলিকে পূর্বের এবং পরের উলামাগণ বিশেষ গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত করিয়াছেন। আল্লামা সুযূতীর “খাসাইসে কুবরা” এবং পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে “আল্-কালামুল মুবীন” (উদ্দু) এই বিষয়ের উপরই লিখা হইয়াছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে ইহার বিশদ আলোচনার সুযোগ নাই। সুতরাং এই পর্যন্তই সমাপ্ত করিতেছি।

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
 عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
 “খোদা তুমি পাঠাও দরুদ
 তাঁর উপরে রোজ শ'বার,
 যিনি তোমার প্রিয় “হাবীব”,
 “সেরা-সৃষ্টি” নিখিল ধরার।”

সবশেষে নবী করীম ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় উপদেশমূলক বাণীও লিপিবদ্ধ করা সমীচীন মনে হইল এবং ইহাদিগকে “জাওয়া মিউল-কালিম” এই স্বতন্ত্র নামে অত্র গ্রন্থের শেষাংশে সন্নিবেশিত করা হইল।

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

১৭ রজব,

১৩৪৩ হিজরী

বান্দা মুহাম্মদ শফী' দেওবন্দী

“জাওয়ামিউল্-কালিম”



চেহেল-হাদীস

নবী করীম^১ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, “যে ব্যক্তি আমার উম্মতের উপকারার্থে ৪০টি হাদীস শুনাইবে এবং হেফয^২ করিবে, আল্লাহ্ তা’আলা তাহাকে কেয়ামতের দিন আলেম ও শহীদগণের সহিত উঠাইবেন এবং বলিবেন, “যে দরজা দিয়া ইচ্ছা বেহেশতে প্রবেশ কর।”

এই বিরাট পুণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে উম্মতের লক্ষ লক্ষ আলেম নিজ নিজ পদ্ধতিতে চেহেল-হাদীস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহা সাধারণে জনপ্রিয় ও কল্যাণকর হইয়াছে।

আমার যোগ্যতা ও ক্ষমতার তুলনায় এই কাজে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছিল; কিন্তু যখন এই অধম কর্তৃক নবী করীম (দঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত “সীরাতে খাতিমুল্-আস্বিয়া” প্রাথমিক শিক্ষার্থী বালক-বালিকাদের পাঠ্য হিসাবে রচিত হইল, তখন সমীচীন বোধ হইল যে, শেষভাগে যদি কিছু হাদীসের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাথমিক শিক্ষার্থী পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা সহজে মুখস্থ করিতে পারিবে।

সুতরাং পরিশেষে সমীচীন মনে হইল যে, পূর্ণ ৪০টি হাদীস সংকলণ করাই উচিত। তাহা হইলে মুখস্থকারীগণও চেহেল-হাদীসের বিরাট নেকীর অধিকারী টিকা

رواه ابن عدى عن ابن عيابل وابن الفخارابي سعيد كذا فى الجامع الصغير ١٠

১০ হাদীস হিফয করার দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে : (১) কণ্ঠস্থ করিয়া লোকজনের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়া অথবা (২) লিখিয়া প্রচার করা।

সুতরাং হাদীসের ওয়াদার মধ্যে ঐ সকল লোকও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন যাহারা চেহেল-হাদীস ছাপাইয়া প্রচার করিয়া থাকেন। এই অবস্থায় চেহেল হাদীসের প্রত্যেকটি কপি ঐ বিরাট পুণ্যের অধিকারী বানাইয়া দেয়। এমন সহজ-লভ্য ও বিরাট পুণ্য হইতে যদি কেহ বঞ্চিত থাকে তাহা হইলে ইহা তাহারই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। সিরাজুল মুনীর শরহে জামে’ সগীর গ্রন্থে এই বক্তব্যটি নিম্নবর্ণিত বাক্যে বাস্তব করা হইয়াছে :

فَلَوْ حَفِظَ فِي كِتَابٍ ثُمَّ نَقَلَ إِلَى النَّاسِ نَخَلَ فِي وَعْدِ الْحَدِيثِ وَلَوْ كَتَبَهَا عَشْرِينَ كِتَابًا.....

হইতে পারিবেন এবং হয়তো তাহাদের বরকতে এই গুনাহগারও ঐ বৃষর্গগণের খাদেমদের মধ্যে পরিগণিত হইবে। وما ذاك على الله بعزیز

জ্ঞাতব্য :

১। এই সমস্ত হাদীস অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস।

২। যেহেতু ইদানিংকালে সাধারণভাবে মুসলমানদের নৈতিক চরিত্র মারাত্মক অবক্ষয়ের দিকে চলিয়াছে, আর শৈশবকালে নৈতিক চরিত্র গঠনমূলক শিক্ষা জীবনে অত্যন্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করে, এই জন্য অধিকাংশ হাদীস ঐ প্রকারেরই উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা উন্নত চরিত্র এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার উত্তম মূলনীতি হিসাবে স্বীকৃত।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১. اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ - (بخارى و مسلم)

“সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে।”

২. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ - رَدُّ السَّلَامِ وَعِبَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ

الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْغَاطِسِ - (بخارى و مسلم)

“একজন মুসলমানের উপর আরেক জন মুসলমানের ৫টি হক রহিয়াছে :

- (১) সালামের জওয়াব দেওয়া,
- (২) রুগ্ন ব্যক্তির সেবা করা,
- (৩) জানাযার সাথে গমন করা,
- (৪) দাওয়াত কবুল করা এবং
- (৫) হাঁচির জওয়াবে “بِإِذْنِ اللَّهِ” বলা।”

৩. لَا يَزِحُّ اللَّهُ مَنْ لَا يَزِحُّ النَّاسَ - (بخارى و مسلم)

“আল্লাহ তা’আলা ঐ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না যে মানুষের উপর অনুগ্রহ করে না।”

টিকা

১০ অর্থাৎ উত্তম নিয়তে উত্তম এবং খারাপ নিয়তে খারাপ ফলাফল হইয়া থাকে।

৪. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ - (بخارى و مسلم)

“চোগলখোর বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।”

৫. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - (بخارى و مسلم)

“আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করিবে না।”

৬. الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخارى و مسلم)

“অত্যাচার কেয়ামতের দিন গাঢ় অন্ধকার রূপ ধারণ করিবে।”

৭. مَا سَفَلَ مِنَ الْكُفْبَيْنِ مِنَ الْأَزَارِ فِي النَّارِ - (بخارى و مسلم)

“গোড়ালীর যতটুকু অংশ লুঙ্গী বা পায়জামার নীচে থাকিবে তাহা দোষখে যাইবে।”

৮. الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ - (بخارى و مسلم)

“ঐ ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান যাহার মুখ ও হাতের অনিষ্ট হইতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।”

৯. مَنْ يُحْرَمِ الرَّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ - (مسلم)

“যে ব্যক্তি নম্র আচরণ হইতে বঞ্চিত সে সকল প্রকার কলাগণ হইতে বঞ্চিত।”

১০. لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -

(بخارى و مسلم)

“ঐ ব্যক্তি বীর নহে, যে কুস্তিতে লোকজনকে পরাভূত করে বরং বীর ঐ ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখিতে পারে।”

১১. إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ - (بخارى و مسلم)

“যখন তুমি লজ্জা করিবে না, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর।”

১২. أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ - (بخارى و مسلم)

“আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সেই আমলই সব-চাইতে প্রিয় যাহা নিয়মিত করা হয়, যদিও উহা পরিমাণে অল্প হয়।”

টিকা

১০. অর্থাৎ যখন লজ্জাই নাই তখন সকল প্রকার মন্দই সমান।

১৩. لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ نَسَاوِيرٌ - (بخاری و مسلم)

“যে ঘরে কুকুর থাকে অথবা কোন জীব-জন্তুর ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।”

১৪. إِنْ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا - (بخاری و مسلم)

“তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সেই ব্যক্তি বেশী প্রিয় যে বেশী চরিত্রবান।”

১৫. الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ - (بخاری و مسلم)

“দুনিয়া মুসলমানদের জন্য কারাগার এবং কাফেরদের জন্য বেহেশ্ত সদৃশ।”

১৬. لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ - (بخاری و مسلم)

“কোন মুসলমানের জন্য তিনদিনের বেশী তাহার মুসলমান ভাইয়ের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা জায়েয নহে।”

১৭. لَا يَلْدَغُ الْمَرْأُ مِنْ حُجْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - (بخاری و مسلم)

“মানুষকে একই ছিদ্রে দুইবার দংশন^১ করা যায় না।”

১৮. الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ - (بخاری و مسلم)

“হৃদয়ের প্রাচুর্যই প্রকৃত প্রাচুর্য।”

১৯. كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ - (بخاری)

“পৃথিবীতে এমনভাবে বাস কর, যেমনভাবে কোন মুসাফির অথবা পথিক^২ বাস করিয়া থাকে।”

২০. كَفَى بِالْمَرْأِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ - (مسلم)

“কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য ইহাই ঘাথেষ্ট যে, সে যাহাই শোনে তাহা যাচাই না করিয়াই অন্যের কাছে বর্ণনা করিয়া দেয়।”

টিকা

১০ অর্থাৎ যাহা হইতে একবার ক্ষতি সাধিত হইয়াছে দ্বিতীয় বার কেহ ইহা নিকটবর্তী হয় না।

২০ অর্থাৎ অতিরিক্ত আড়ম্বর ও জাঁক জমক পরিহার করিবে।

২১. عَمَّ الرَّجُلِ صَبَوُ أَبِيهِ - (بخارى و مسلم)

“মানুষের চাচা তাহার পিতার মতই (শ্রদ্ধার পাত্র)।”

২২. مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (بخارى و مسلم)

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তাহার দোষ গোপন রাখিবেন।”

২৩. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرَزَقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ - (مسلم)

“সেই ব্যক্তি সফলকাম হইয়াছে, যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাকে প্রয়োজন মাফিক রিয়ক প্রদান করা হইয়াছে এবং আল্লাহ তাআলা তাহাকে তাহার রুখির উপর সন্তুষ্টি দান করিয়াছেন।”

২৪. أَشَدُّ النَّاسِ غَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُضَوَّرُونَ - (بخارى و مسلم)

“চিত্রকরগণ কেয়ামতের দিন সবচাইতে কঠিন আযাবে লিপ্ত হইবে।”

২৫. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ - (مسلم)

“মুসলমান মুসলমানের ভাই।”

২৬. لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ - (بخارى و مسلم)

“কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হইতে পারিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভাইয়ের জন্য সেই জিনিস পছন্দ না করিবে যাহা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।”

২৭. لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ - (مسلم)

“যাহার অনিষ্ট হইতে তাহার প্রতিবেশীগণ নিরাপদ নহে, সে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।”

২৮. أَنَاخَاتُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيٌّ بَعْدِي - (بخارى و مسلم)

“আমি সর্বশেষ নবী। আমার পরে আর কোন নবী আগমন করিবেন না।”

۲۹ لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
 أَخْوَانًا - (بخاری)

“পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করিও না, একে অন্যের ছিদ্রাশ্রয়ণ করিও না, পরস্পর
 দ্বন্দ্বীতা পোষণ করিও না, একে অন্যকে হিংসা করিও না এবং হে আল্লাহর বান্দাগণ!
 তোমরা সকলে ভাই ভাই হইয়া বাস কর।”

۳۰. أَنْ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَإِنَّ الْهَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَإِنَّ الْخَجَّ يَهْدِمُ
 مَا كَانَ قَبْلَهُ - (مسلم)

“ইসলাম সেই সমস্ত পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে
 করা হইয়াছে। হিজরত সে সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা হিজরতের পূর্বে
 করা হইয়াছে এবং হজ্জ সে সকল পাপকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় যাহা হজ্জের পূর্বে
 করা হইয়াছে।”

۳۱. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيِّبِ - (بخاری و مسلم)

“সকল কাজের ভালমন্দ পরিণামের উপর নির্ভর করে।”

۳۲. الْكِبَارُ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَفْوُ الْوَالِدِينَ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ -
 (بخاری و مسلم)

“কবীর গুনাহ এইগুলোঃ আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক মনে করা,
 মাতা-পিতার অবাধাতা, কোন নিরপরাধকে অনায়াভাবে হত্যা করা এবং মিথ্যা
 সাক্ষ্য দেওয়া।”

۳۳. مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرْبِ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا
 سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
 الْحَدِيثُ - (مسلم از مشكوة)

“যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন পার্থিব বিপদ হইতে মুক্ত করিবে আল্লাহ
 তা'আলা তাহাকে কেয়ামতের অগণিত বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। যে ব্যক্তি
 সেনদনের ব্যাপারে কোন দরিদ্র লোকের সহিত সহজ ব্যবহার করিবে আল্লাহ
 তা'আলা দনিয়া ও আখেরাতে তাহার সহিত সহজ ব্যবহার করিবেন। যে ব্যক্তি

কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখিবে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাহার দোষ গোপন রাখিবেন। বান্দা যতক্ষণ তাহার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যে লাগিয়া থাকিবে আল্লাহ্ তা'আলা ততক্ষণ তাহার সাহায্যে লাগিয়া থাকিবেন।”

২৬. أَبْغَضَ الرَّجَالِ عِنْدَ اللَّهِ الْأَلْدُ الْخَصِيمُ - (بخارى و مسلم)

“ঝগড়াটে লোক আল্লাহর নিকট সব চাইতে বেশী ঘণার পাত্র।”

২৭. كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - (مسلم)

“প্রত্যেক বিদ-আতই ভ্রষ্টতা।”

২৮. الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ - (مسلم)

“পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।”

২৯. أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا - (مسلم)

“মসজিদসমূহই আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয়স্থান।”

৩০. لَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ - (مسلم)

“কবরসমূহকে সিজদার জায়গা বানাইও না।”

৩১. لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ - (مسلم)

“নামাযের মধ্যে কাতারসমূহকে সোজা করিও, নতুবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিবেন।”

৩২. مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ عَشْرًا - (بخارى)

“যে ব্যক্তি একবার আমার উপর দরুদ পাঠ করে আল্লাহ্ তা'আলা তাহার উপর দশবার রহমত প্রেরণ করেন।”

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِنَ الْمُخْصُوصِ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَخَوَاصِّ الْحِكْمِ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

w.e-ilm.weebly.c